রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ

আবদুর রউফ চৌধুরী

প্রতিবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁকে শুধু প্রতিবাদী কবি বললেই তাঁর সম্বন্ধে সবকথা বলা হয় না, তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবি, তবে একথা সত্য যে, তিনি ভেঙে দেন– মিথ্যা, জীর্ণ, অসুন্দরকে সবলে; তারপর একটি সুন্দর বাস্তবসত্যের সৃষ্টি করেন। তিনি পরাধীন দেশের কবি, তাই তাঁর সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলের ছাপ থাকাই সম্ভব, কবির কাছে ভাঙার বাণীই উচ্চারিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। পরাধীন দেশের কবির সব চেয়ে প্রিয়স্বপ্নই ছিল বাঁধনছেঁড়ার আহ্বান– রাজভয়, মৃত্যুভয় পরিহার করে, অন্যায়কে সকল শক্তি দিয়ে আঘাত করে প্রতিবাদ প্রকাশের ছায়াছবি তৈরি করা; আঘাত যত গুরুতর, বেদনা যত নিবিড়, অত্যাচার যত দুঃসহ অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও হয় তত প্রকট, তাই কবি বলেছেন,

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি'
নির্ভয়ে আজি গাহরে।[১]

রাজার ভয়ে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দিতে পারেন নি কবি। তাই বলেছেন,

তুমি যা দিয়েছ মোরে অধিকার ভার
তাহা কেড়ে নিতে দিলে অমান্য তোমার।[২]

মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ হলে কবি ঈশ্বরের সঙ্গেও আপস করবেন না, যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনি একাই চলবেন,

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।[৩]

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'একলা চলো রে' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্যসাধনে কবি শুরু করেন তাঁর প্রতিবাদ, যে সাধনা পাষাণ-কঠিনের সাধনা, সত্যের সাধনা, মুক্তির সাধনা, শক্তির সাধনা, প্রাণের সাধনা; শুরু হয় দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচার জন্য সুনির্দিষ্ট পথ বাতিয়ে দেওয়া, বাঁচার মতো বাঁচা এবং টিকে থাকার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান তাই প্রকাশ করেছেন। মানুষ যেখানে

[১] জাতীয় সঙ্গীত।
[২] স্বদেশ।
[৩] জাতীয় সঙ্গীত।

নানারকম বিধিনিষেধের প্রাচীর গড়ে তুলে, নিজেকে নিজের মধ্যে বন্দী করে রাখে, মনমগজকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে নিষ্ঠুর পাথর-চাপা দিয়ে, বাইরের জ্ঞানালো নিজের মধ্যে প্রবেশ না-করার জন্য অশুচি বলে আক্রমণ করে– তাদের বিরুদ্ধে, দাসত্বের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন ।

তাসের দেশ

'তাসের দেশ'[৪] নাটকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক সমাজ সৃষ্টি করেছেন যেখানে গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া সকলই তাসবংশীয়, তারা বাস্তবিক জ্ঞানালোর বাইরে, বহুদূরের এক দ্বীপের বাসিন্দা । 'তাসের দেশ'-এ বাইরের জ্ঞান, আলো, বাতাস ও মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, বহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । 'তাসের দেশ'-এর অধিবাসী স্বতন্ত্র– আকৃতিপ্রকৃতি কিছুই মানুষের সঙ্গে মিলে না, আচার-আচরণও অদ্ভুত– মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী । এখানে যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, প্রগতিহীন নানা রীতিনীতি প্রচলিত, গতিচাঞ্চল্যহীন পরিবেশ, জীবনচিন্তাচেতনা প্রাচীন, নিয়মপদ্ধতি শাস্ত্রের বিধিপ্রথা অনুযায়ী, বংশমর্যাদা ও শ্রেণীবিন্যাসে কোনও গড়মিল নেই– একের সঙ্গে আরেক বর্ণের মানুষ 'এক পংক্তি'তে বসে না । এখানে আইনের কোনওরকম শীতলতা নেই, ঘটলে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, কারণ বিহর্সমাজের সমস্ত জ্ঞানালো এদের মধ্যে যাতে প্রবেশ করতে না-পারে সেজন্য তারা সবসময় সচেতন, সযত্নে নিজের সমাজের অন্তরে কুংস্কারকে রক্ষা করে চলে ।

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গ[৫] থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ নাটকের মূল বক্তব্যটি কী? গতানুগতিকতা, পুরাতন নিয়মানুবর্তিতা, পরিবর্তনহীনতা নিগড়ে বাঁধা যেসমাজ তার জীবন্মৃত অবস্থাই এতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় । 'তাসের দেশ' শুধু পুরাতনের নূতন রূপ নয়, গান-কথা-রস-ভাষা-আইন-রাষ্ট্র-তথ্যেও ভরপুর । অশোক সেন বলেছেন, 'এখানে রূপান্তর শুধু নয়, যেন জন্মান্তর ঘটেছে । নবরূপে শুধু নির্জীবতা নিন্দিত এবং প্রাণ বন্দিত হয়নি, [...] এখানে প্রসঙ্গত বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, সংস্কার নিয়ম, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি বিবরণ, খবরের কাগুজে ভাষা, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন ইত্যাদিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে ।'[৬] আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শুষ্ক নিয়মানুবর্তিতা সর্বনাশেরই পথে লইয়া যায় এবং মানুষকে মৃতকল্প করিয়া ছাড়ে । এ যেন আমাদেরই সনাতনপন্থী নির্জীব অলস বিশেষত্বহীন পরিবর্তন-পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষকেই কবি 'তাসের দেশ'-এর ভিতর দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন ।'[৭]

'তাসের দেশ'-এর শাস্ত্রবিধি ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ প্রকাশ করে, সমাজের তথাকথিত শৃঙ্খলার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সে হচ্ছে রাজপুত্র, নাটকের প্রধান চরিত্র । সে চাঞ্চল, বিজ্ঞানের চেতনায় আলোকিত, অনাসক্ত পুরুষ, সে যৌবনের দূত, দুঃসাহসী ও বেপরোয়া, সে নিত্যনৈমিত্তিক 'এক ঘেয়ে' জীবনে হাঁফিয়ে ওঠে সহজে, চায় উন্মুক্ত জীবন– অজানাকে জয় করা, নূতন জীবনের প্লাবন ও সত্যকে আবিষ্কার করা, তাই রাজবাড়ির দিনগুলোর গতানুগতিকতায় সে বিষণ্ন ও উদাসীন, এখানে নিয়ম মতো চলতে হয় তাই তার ভোগে রুচি নেই, মনে সুখ নেই, সে যেন সোনার মন্দিরের পাথরের দেবতা, দিনরাত শুধু শুনতে পায় শঙ্খ আর কাঁসার ধ্বনি, অন্যকিছু কানে পৌঁছোয় না । এমনকি রাজপুত্র যখন শিকারে যায়, তখন বাঘগুলোকে রাজশিকারি আফিম খাইয়ে রাখে, এরকম পরিহাস তার আর সহ্য হয় না, সে চায় অসত্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যের সন্ধান

---

[৪] ১৯৩৩ সালে 'তাসের দেশ' নাটক হিসাবে রচিত হয়, আষাঢ় ১২৯৯ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বন করে; রূপকথার আবহ বজায় রেখে গান, নাচ, সংলাপ ও দৃশ্যযোজন করে 'তাসের দেশ' তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ । মূলভাবের দিকে 'অচলায়তন'-এর সঙ্গে এর একটি সাদৃশ্য আছে । ১৩৪০ সালে 'চণ্ডালিকা'র সঙ্গে 'তাসের দেশ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ।

[৫] 'কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,/ স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম ।'– চণ্ডালিকা, ১৩৪০ ।

[৬] রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা, ১৯৫৮ ।

[৭] একটি আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ ।

করতে। তার মনে প্রতিবাদ জমে ওঠে, আর এ প্রতিবাদ প্রকাশ করতেই একদিন বন্ধু সদাগরপুত্রের নিয়মমাফিক কাজের আহ্বানে বলে, 'নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'[৮] রাজপুত্র বেরিয়ে পড়তে চায় সোনার খাঁচা থেকে, যেতে চায় বাণিজ্যে, নূতনের সন্ধানে, নিরুদ্দেশে, ছেড়ে যেতে চায় লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর সন্ধানে– লক্ষ্মী তো ভীরু করে, অলক্ষ্মীই ঘরছাড়া করে, লক্ষ্মীছাড়াদেরই কেবল সাহস থাকে। ঐশ্বর্যের মোহে যে মুগ্ধ সে কীভাবে পারে আধমরাকে বাঁচাতে? নিজের মধ্যে ত্যাগ ও শৌর্য যদি না-থাকে তবে অন্যকে রক্ষা করবে কীভাবে? বিপদ না-থাকলে ভরসা থাকে না, তাই রাজপুত্র চায় কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে যেতে, নিরুদ্দেশের পথে, নূতন দেশের অন্বেষণে, নবীনার সন্ধানে। রাজপুত্র অনাসক্ত, তাই দুঃসাহসী। রাজপুত্র শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেতকরবীরগুচ্ছ পরে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুহৃদ বন্ধুকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে চিরনবীনার উদ্দেশে। সাগরজলে তরী ভাসিয়ে উদ্বেলিত চিত্তে দুবন্ধু রওয়ানা দেয় চির-অজানার পথে, কূলে পৌঁছতে না-পারলেও তাদের মনে কোনও শঙ্কা নেই, দ্বিধা নেই; তারা সমুদ্রের তলদেশ আবিষ্কার করতে সক্ষম, ওরা যে 'নতুন যৌবনের দূত'।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, তরী যায় ভেঙে, ঝোড়ো হাওয়ার উপহার স্বরূপ ভাঙাতরীটিকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে কূলে, আজব দ্বীপে, 'তাসের দেশ'-এ, যা নতুনও না, পুরাতনও না। সদাগরপুত্রের চোখে মনে হয় এ যেন 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন'। লোকগুলো 'বেঁচেও নেই মরেও নেই', কাগজের তৈরি, বুক-পিঠ এক, চেপটা, পা ফেলে 'খিট্‌খুট্' শব্দে, 'চৌকো-চৌকো কেঠো চালে' নড়েচড়ে, শোয়বসে একবারে অকারণে, উঠাবসা, চলাফেরা, নড়াচড়া সবই নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। এদের অস্তিত্বকে না-বলে ঘুম, না-বলে সজাগ, কথা বলে কাব্যের কথায়, শুধু ছন্দটি বের করে আনে, কিন্তু অর্থের বালাই নেই, আর কাজ করে উদ্দেশ্যেহীন, হাসতে জানে না, হাসির নিয়ম তাদের অজানা, কাদে না, সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই, স্বকীয় নিয়মের শিকলে বাঁধাপড়া ওদের জীবন– চাল আছে কিন্তু চলন নেই, চলে বটে কিন্তু এগোয় না, একটা নিয়মের বন্ধনে যেন তারা আবদ্ধ। নানা প্রথাসংস্কার আকরে রেখেছে তারা, প্রথা ও আচারাচরণের দাস, নির্বিবাদে ওরা শৃঙ্খলার সঙ্গে এ-নিয়ম মেনে চলে, যে-নিয়মের উদ্দেশ্যের কারণটিও বোঝার মতো ব্যক্তিত্ব, সজীবতা এদের মধ্যে নেই, যন্ত্রের মতোই ওরা– প্রাণহীন, নির্জীব। ওদের জাত-কুল-গোত্র-জ্ঞাত-গোষ্ঠী শ্রেণীপংক্তি আছে– প্রচীনকাল থেকেই এদের সমাজে পদমর্যাদার ছকবাঁধা, এর পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করে না তারা। এ-জাতির উদ্ভব হয়েছে ব্রহ্মার 'হাই' থেকে, তারপর চতুর্বর্ণে বিভক্ত, সনাতনপন্থী– সমাজে কার কী মূল্য ও কোথায় কার-পরে-কার স্থান তা স্থির করা আছে; ঔচিত্য, অনৌচিত্যের মূল্য নিয়ে কেউ বিচারবিবেচনা করতে সাহস পায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম এখানে কায়েমী, গায়ে ফোঁটা কেটে সবাইকে মূল্য তথা মান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে– দুরির চেয়ে তিরি বড়, তিরির চেয়ে চৌকো, তারপর পঞ্জা, ছক্কা ক্রমে দহলা পর্যন্ত, তার উপর গোলাম, সাহেব, টেক্কা– 'সাড়ে সাঁইত্রিশ' রকম জাত নিয়ে অভ্যস্ত জীবনে বাঁধানিয়মের তালে তালে পা ফেলে তাসবাসীরা বেশ আরামেই ছিল, কিন্তু হঠাৎ 'তাসের দেশ'-এ উপস্থিত হয় অলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যের যাত্রীরা, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে অনিশ্চিয়তার দিকে যারা ধাবিত হয়েছে, যারা চায় সবকিছু ওল্টোপাল্টো করে দিতে, ঢাকাপরা দেশের ঢাকনা খোলে দিতে, তারা জানে ঢাকনা খোলে দিলেই 'ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা'রূপটি বেরিয়ে আসবে, তারা জানে 'বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে। নইলে এগোব কী করে', কিন্তু ওরা যে 'তাসের দেশ'-এর 'বিদেশী'। 'বিদেশী'র দিকে তাসবাসীর দৃষ্টি পড়লেই তারা হয় অশুচি, কারণ তাসবাসীরা পণ করেছে কোনওরকমের পরিবর্তনকে ওরা মানবে না– এ প্রতিজ্ঞায় যারা আবদ্ধ তারা 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উদ্যোক্তাকে স্বভাবতই মনে করে সমাজের শত্রু, 'বিদেশী'রা উৎপাত করতে এসেছে তাদের জ্বালাতে, তাই কোনওকারণে যদি তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় 'বিদেশী'র উপর তাহলে তাদের 'বাদুড়ে-খাওয়া গাবের আঁঠি পুড়িয়ে তিনদিন চোখে কাজল' পরে থাকতে হবে, তবেই উদ্ধার, তবেই স্বর্গে তাদের 'পিতামহদের উপোস ভাঙবে'। 'তাসের দেশ'-এর রাজা নূতনদের উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্যে ভরা মন্তব্য করেন, 'বিদেশী!' ওরা সেই বিদেশী, যারা বাঁধনবান্ধন ভেঙে সমস্ত কিছু নিজের মতো যাচাই করে দেখতে চায়, অকূলের উদ্দেশ্যে তরী ভাসিয়ে বিশ্বপরিভ্রমণ

[৮] তাসের দেশ।

করে বিচার করতে চায় নিজেকে। বিদেশীর আবির্ভাবে তাসবাসীরা চমকে ওঠে, সমাজে ঝড় শুরু হয়, হালকা হাওয়াতেই প্রথম ঝড় আসে, কিন্তু এতেই মান্ধাতার আমলের নিয়মের তাল যায় কেটে, যুগযুগ সঞ্চিত সংস্কারের আবর্জনাকে উড়াতে থাকে নিময়ভাঙার উন্মাদনায়। শুরু হয় ধরাবাধা জীবনে চাঞ্চল্যতা, ছন্দপতনতা, আস্তে আস্তে বিপ্লব, জাগরণ। তাসবাসীদের মনে জেগে ওঠে– ইচ্ছা, মুক্তির তৃষ্ণা, সনাতন নিয়ম ভাঙার উন্মাদনা। ক্রমে তাসবাসীরা বুঝতে শিখে, এ-দ্বীপের মধ্যে থমকে থাকা যে ঘোলাটে জীবন তার বাইরে প্রবাহিত হচ্ছে আরেকটি জীবনধারা, মুক্তির জয়গান, কিন্তু সম্পাদক শোনতে পায় এরই মাঝে সর্বনাশের বাঁশি, তাই 'তাসের দেশ'-এর কৃষ্টিরক্ষা করার জন্য সে পদক্ষেপ নেয়, বলে, 'বাধ্যতামূলক আইন চাই।' এ আবার কী! 'কানমলা আইনের নব্য ভাষা।' 'তাসের দেশ'-এর নবতম অবদান। অবশেষে গতানুগতিক জীবনযাত্রা নেহাতই অদ্ভুত বলে তাসবাসীদের কাছে উদয় হতে শুরু করে, শুরু হয় নিময়ভাঙার আন্দোলন। স্বাভাবিক জীবনের ধাক্কায় তাদের জীবনচক্রে অরাজকতা দেখা দেয়। দেশের সকলেই আইন অমান্য করতে শুরু করে, তারা চালায় 'অবাধ্যতামূলক বে-আইন'। তারা আর বসে থাকতে পারে না। কেউ গান করে, কেউ ফুল তুলে, কেউ লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে, কেউ অকারণে হেসে ওঠে। এমনকি ঊর্মিলা নদীটিও মুক্ত মনে বয়ে চলে আপন তালে, পাখিরা গান গায় নিকুঞ্জকাননে, সখীরা শুনে তাদের মাঝে প্রেমের প্রলোভন। সবদিকে জেগে ওঠে 'ইচ্ছে!' চারদিকে নিয়মভাঙার ডাক যেন। বিদেশীরা এদেশে নিয়ে আসে মুক্তির গান– অশান্তির চঞ্চলতা, নিয়মের অবাধ্যতা। এ-বিদেশীদের প্রাণচঞ্চল হাওয়ায় দেশের সংস্কার, যা ছিলো ঘুণে ধারা, ভেঙে যায়; তাসের বিরাট সৌধ হয় ধূলিসাৎ। বিদেশীর যৌবনচঞ্চল ছোঁয়ায় এ-জীবন্মৃতদ্বীপে আসে জাগরণ, নূতন আলোড়ন। এতদিন যারা ছিল প্রাণহীন আজ তারা হয়ে ওঠে নূতন স্পন্দনে, স্বাধীন ইচ্ছের প্রাণশক্তিতে আপ্লুত। সকল কুসংস্কার, জড়তা, নিয়মতান্ত্রিকতা ছিন্ন হয়ে যায়, বাঁধনভেঙে যায় জীবনচেতনায়, শুকনো নদীতে আসে জীবনের 'উদ্দাম কৌতুক'।

'তাসের দেশ' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেকথাটি প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে— প্রাণহীন, অর্থহীন, কুসংস্কারযুক্ত নিয়মনীতির আওতায় পরিচালিত কোনওরকম সমাজব্যবস্থাই চিরকাল চলতে পারে না। পুরাতনকে ভেঙে নূতনের সৃষ্টির আদর্শই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পের উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছেন মানুষের আত্মার মুক্তি, এ-চিন্তারই রূপ নিয়েছে 'তাসের দেশ'-এ, গভীর জীবনবোধ, অসাধারণত্বের স্বাক্ষর। সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈদিক জীবনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষকে সচেতন হতে হয়, কারণ মানুষের বোধ, তার চিন্তা, তার আচারাচরণ কোনও বিশ্বাত্মার ইচ্ছে অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না, এগুলো বাস্তবজীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়। সক্রিয় জীবনপন্থাই সচেতন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

'তাসের দেশ'-এ রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষের মুক্তির কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল ঐকান্তিক, অভ্রান্ত, সক্রিয় ও আন্তরিক। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনসংগ্রামই শিল্পসাহিত্যে প্রতিফলিত হোক এবং সে শিল্পসাহিত্যই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তিলাভের পথ উন্মুক্ত করে দিক– এ ছিল ববীন্দ্রনাথের অভীষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ। এরই সঙ্গে কবি বলতে চেয়েছেন অলসের বেড়া ভাঙতে হবে, প্রগতির পথে প্রচণ্ডতম অন্তরায়কে আবর্জনা বলে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। অর্থহীন-মৃত অতীতের আচার ও নিয়মনীতিকে বুকে আকড়ে ধরে নিশ্চিত মনে পড়ে থাকা নিষ্প্রয়োজন, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তারপর যুদ্ধ করতে হবে।

'তাসের দেশ'-এর ভিতর দিয়ে পরাধীন দেশবাসীকে ইচ্ছেমন্ত্রই প্রদান করেছেন। বলেছেন যে, আমরা আমাদের ইচ্ছেশক্তিকে কোনওশক্তির কাছে বলি দিতে রাজি না, হোক সেশক্তি রাষ্ট্রশক্তি, শাষকশক্তি, নিয়মশক্তি, আইনশক্তি বা সমাজপতিদের শক্তি। আত্মপ্রকাশের পথে রবীন্দ্রনাথ কোনও বন্ধনকেই স্বীকার করতে চান নি, কারণ তিনি যেমনি ছিলেন দুঃসাহসিক, তেমনি অভিনব চিন্তার নায়ক– জীবনবোধের গভীরতা ও ব্যাপকতা থেকেই এর জন্ম, এবং এবোধ অনেক পরিমাণে বাস্তবজীবনদর্শনের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ, জীবন ও শিল্প অভিন্ন। তিনি যেমনি নিজের জীবনকে ভেঙে ভেঙে নূতনভাবে গড়ে এক অনুপম শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পসাধনার মাধ্যমে নূতন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই জীবন ও শিল্প

তাঁর কাছে অভিন্নার্থক। অহিংসা, শান্তি ও মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র ও প্রেমসম্পর্কের আর্দশ ঘোষিত হয়েছে তাঁর শিল্পসাধনার বাণীতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, যৌবনের আনন্দে ভয়হীন সজীবনবীন তরুণরা নূতনের আহ্বানে জীর্ণপুরাতনকে ভেঙে দেবে। এ 'তাসের দেশ' হচ্ছে সনাতনপন্থী বাংলাদেশ। কতবার কত রাজা-মহারাজার আবির্ভাব ঘটেছে এদেশে। তারা বাঙালির কানে কানে বলে গেছেন, ভাঙতে হবে এখানকার সব অলসতার বেড়া, ভাঙতে হবে নির্জীবের গণ্ডি, রাজাকারের আস্তানা, ঠেলে ফেলতে হবে এসব নিরর্থক আবর্জনা, ছিঁড়ে ফেলেতে হবে কুসংস্কারের আবরণ টুকরো টুকরো করে। হে তরুণ মুক্ত করো, শুদ্ধ করো, পূর্ণ করো বাংলাদেশ।

শ্যামা

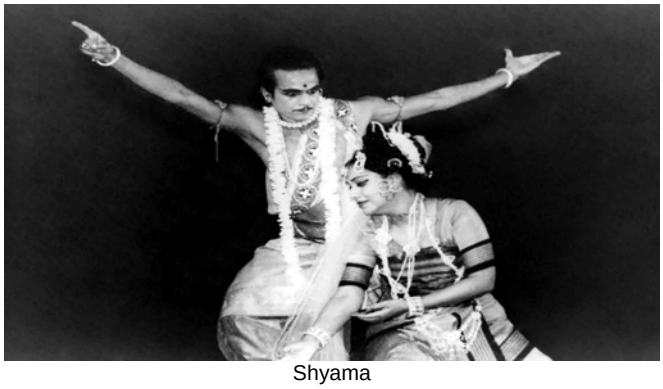

Shyama
Shanti Bose as Bajrasen & Aloknanda Roy as Shyama

'শ্যামা'র মূলবিষয়টি হচ্ছে আহত-প্রেম– প্রেমের বিকৃতরূপ; একদিকে যেমন প্রেমের জন্য হাসি মুখে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেওয়া যায়, তেমনি আহত-প্রেম যে শেষপর্যন্ত আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে, পরিণামে সত্যবোধের উন্মোচন ঘটায়– এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'শ্যামা' নৃত্যনাটকটি। এই 'শ্যামা'তে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে ন্যায়বোধের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব– বজ্রসেন প্রেমের জন্য বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্যামাকে ক্ষমা করতে না-পেরে অন্তরদাহে জ্বলছে, আর শ্যামা তার প্রেমের কারণে বাস্তবের সীমানা লঙ্ঘন করতে গিয়ে বাস্তবতাকেই অস্বীকার করতে পারছে না, তাই ন্যায়বোধের উন্মোচন ঘটেছে; একই কথার সাক্ষ্য মিলে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটকেও, সেখানে তিনি বলেছেন, 'সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।'[১] শ্যামা, উত্তীয় ও বজ্রসেনের ত্রিমুখী প্রেম এবং তার পরিণতিই এই নৃত্যনাটকে প্রকাশ পেয়েছে। ভাদ্র ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে স্বরলিপিসহ 'শ্যামা' নৃত্যনাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়, যার মূলভিত্তি হচ্ছে আশ্বিন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 'পরিশোধ' কবিতাটি।[২] 'শ্যামা'র আখ্যান অংশ অবশ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত 'দি সাংস্কৃত বোদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল'[৩] গ্রন্থের বর্ণিত-বিবরণ গদ্যাংশটি থেকে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের নায়িকা শ্যামা। রাজনটী। সুন্দরী। তার প্রেমে উত্তীয় উন্মাদ। উত্তীয় চায় 'গহনস্বপনসঞ্চারিণী'কে দূর থেকে আনন্দের অমৃতরূপে চিত্তে, গোপন বিরহডোরে, বাঁধতে; যে বাঁধন হবে বাঁধনহীন, যা 'চমকিবে ফাগুনের পবনে'; তাই শ্যামার সহচরীদের করুণা হয় তার উপর। সখীরা উত্তীয়কে আঁধার গুহার তলে ভোলায়ে না যাওয়ার জন্যে আহ্বান করে 'হতাশ হোয়ো না ... সখা' বলে। তার সঙ্গে সখীরা উত্তীয়কে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'হবে সখা, হবে তব হবে জয়'। আর শ্যামা চায় নিজেকে সপে দিতে তারই উদ্দেশ্যে যে আছে

[১] রাজা ও রাণী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[২] গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী।

[3] 'Story of Syama and Vajrasena- The reason why Buddha abandoned his faithful wife Yasodhara is given in the following story. / There was in times of Yore a horse-dealer at Takshasila named Vajrasena; on his way to the fair at Varanasi, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Varanasi, he was caught by policeman as a theif. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Syama, the first public woman in Varanasi. She grew enamoured of the man, and requested one of her handmaids to reduce the criminal at any hazard. By offering large sums of money she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and execute the orders of the king on another, a banker's son, who was an admirer of Syama. The latter not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal, and was served in two by the executioners. / The woman was devotedly attached to Vajrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when they both set on a pluvial execursion. Vajrasena plied her with wine, and, when she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand came to her rescue, and by great assiduity resuscitated her. Syama's first measure, after recovery, was to find out a Bhikshuni of Takshasila, and to send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena, and Syama, Yasodhara.' - The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882.

সঙ্গোপনে, আড়ালে আড়ালে। সে চায় পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ-আশা প্রকাশ করতে, সেই ভাষায় যার ছন্দে সে পাবে পথহারা পবনের আহ্বান আর ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধ; কিন্তু শ্যামা এর সন্ধান পায় না। এমনি সময় বজ্রসেন ছুটে আসে শ্যামার সভাগৃহের দিকে, কোটাল তার পিছু পিছু। অন্যায় অপবাদের ফাঁদে না-পড়ার বাসনায় বজ্রসেন প্রতিবাদ করে, 'নই আমি নই চোর।' কিন্তু কোটাল বাঁধা সাধে, 'ঐ বটে, ঐ চোর, ঐ চোর।' শ্যামা তার সভাগৃহ থেকে সেদিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে; আর তখনই সে দেখতে পায় 'মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন' বজ্রজেনকে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে চোরের মতন বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে রাজার প্রহরীরা। বন্দীকে এ-অবস্থায় দেখে শ্যামার মনে একটি অনুভূতি জেগে ওঠে; তার অন্তরাত্মায় একরকম রহস্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়; তাই সে বন্দীসহ রাজার প্রহরীকে হাজির হতে অনুরোধ করে। কোটাল বজ্রসেনকে নিয়ে শ্যামার আলয়ে হাজির হলে বন্দীর দেহ-সৌন্দর্যে শ্যামা সন্ধান পায় একটি প্রেম-ইচ্ছের নিদর্শন; এই সৌন্দর্য তার কামনা-বাসনার লুপ্তপ্রায় শক্তিকে জাগ্রত করে, তাই সে প্রহরীর কাছে জানতে চায় বন্দীকে কোন দোষে বন্দী করা হয়েছে। প্রহরী জানায় যে, রাজকোষ চুরি হওয়ার জন্যই তাকে বন্দী করা হয়েছে; কারণ, যে করেই হোক একজন চোরকে বন্দী করতেই হবে, নতুবা মানসম্মান সবই যাবে। একথা শুনে শ্যামা প্রহরীকে অনুরোধ করে, নির্দোষী বন্দীর প্রাণ রাখার জন্যে তার দুদিন সময়ের প্রয়োজন। প্রহরী রাজি হয়। বন্দীর সামনে যে-ঘটনাটি ঘটে গেল তা যেন তার কাছে একটি খেলা, একটি কৌতুক; কিন্তু শ্যামার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, এ-যে কৌতুক নয়, বরং সে মনে করে 'রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।' শ্যামা ভাবতে থাকে কীভাবে এই অবিচারের ফাঁদ থেকে, এই অন্যায় অপবাদ থেকে নিরাপরাধ একজন বন্দীকে রক্ষা করা যায়। সে সন্ধান করতে থাকে একজন ত্রাণকার্তার, পেয়েও যায়, সে-যে উত্তীয়– যে জানে না ন্যায়-অন্যায়, শুধু জানে শ্যামার প্রেমের চরম মূল্য কীভাবে দেওয়া যায়, যার জন্য প্রয়োজনে সে নিজেকে মরণডোরে সপে দিতে দ্বিধা করবে না, কারণ তার ইচ্ছে নিজেকে উৎসর্গ করে হলেও শ্যামার বক্ষে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়ে যাওয়া, সে তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তার প্রেমকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে ভয় পায় না, ত্যাগের মাধ্যমেই ত সমস্ত সৃষ্টির মূলশক্তি মুক্তির লাভ ঘটে। তারপর শ্যামা যখন রাজাঙ্গুরী উত্তীয়কে দান করে তখন সে হাসি মুখে তা গ্রহণ করে বলে, 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—তুমি জান নাই, ... তার মূল্যের পরিমাণ।' শ্যামার প্রতি উত্তীয়ের প্রেম—স্বাধীন, দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত; এই প্রেম কোনওরকম কৈফিয়ৎ মানে না, চায় না নির্গুণ-সুগুণ, জানে না ভালোমন্দ; এ-যে শ্যামার সীমানার মধ্যে ধরা থাকে আবার শ্যামার সীমানা অতিক্রম করে তাকে আলিঙ্গন করার খেলায় মেতে ওঠে; এ-যে ত্যাগ ও তৃপ্তি দুটোই; তাই সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়া ছাড়া এই প্রেমে আদানপ্রদান চলে না– এসব উত্তীয় উপলব্ধি করে বলেই শ্যামাকে শেষবারের মত অনুরোধ করে সে যেন মুখ তুলে তার দিকে একবার তাকায়। উত্তীয় চায়, সে তার মধুর-মরণে পূর্ণ করে সঁপে দিতে আপন প্রাণ। উত্তীয়ের হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকায় শ্যামা, কিন্তু কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকার পর উত্তীয় আস্তেধীরে প্রস্থান করে; আর সেই বিদায় পথের দিকে তাকিয়ে, দূর থেকে, সখীদের বুক কেঁপে ওঠে, তারা বলে, 'তোমার প্রেমের বীর্যে তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।' উত্তীয় সেদিকে কান দেয় না, বরং নিজেকে আত্মসমর্পণ করে প্রহরীর কাছে, সখীরা তা সহ্য করতে পারে না, তাই একজন সখী ভেবে চলে যে, নিষ্কারণে কেন উত্তীয় তার তরুণজীবন মৃত্যু-পিপাসিনীর পায়ে ঢেলে দিয়েছে, যতই ভাবে ততই তার বুক ফেটে যায়। অন্যদিকে শ্যামার প্রেম উত্তীয়ের মত মুক্ত নয়, হলে ত সে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত, তার প্রেম দ্বৈত-অদ্বৈত, স্বস্তির-অস্থির, স্বাধীন-অধীন; এর প্রকাশ আশ্চর্য, বিকাশও আশ্চর্য; এ-হচ্ছে বিরোধের সামঞ্জস্য; তাই শ্যামা যখন বুঝতে পাড়ে তারই ছলনায় উত্তীয় চরমদণ্ডের মুখে উপস্থিত তখন সে দ্রুত কারাগারে প্রবেশ করে প্রহরীকে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রহরী সে-কথায় কান দেয় না, বরং তাকে চুপ করে দূরে সরে যেতে আদেশ করে; আর তখনই, কারাগারে, উত্তীয়'র মৃত্যু ঘটে। উত্তীয়র মৃত্যুর পরই শুরু হয় বজ্রসেন ও শ্যামার প্রেম। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন যে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয় না। অন্যদিকে শ্যামা আর চায় না সুখস্বপ্নের ঘুরে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে; সে চায় নতুন প্রেমে নিজেকে জাগ্রত করতে, চায় আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে, জগতের বিচিত্র-সৌন্দর্যের মাঝে, কৃষ্ণের বাঁশির সুর শুনতে; তবে এ-যে বজ্রসেনের ইচ্ছের উপরই নির্ভর করে। শ্যামার মনের মধ্যে বাজতে থাকে শঙ্কার ডঙ্কা, যেন দূরে ভীষণ নীরবে ঝড়ঝঞ্ঝা

ঘনিয়ে আসছে। শ্যামার মনের মধ্যে যখন এসব দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তখনই সে তার হৃদয়স্বামী, জীবনমরণের প্রভু বজ্রসেনকে প্রেমের আহ্বান করে। বজ্রসেনও জানে, শ্যামার জন্যেই তার মৃত্যুগহনে লেগেছে অমৃতসুগন্ধ; এই মুক্তিরূপা-লক্ষ্মী-দয়াময়ীর জন্যেই ত তার হৃদয় ও দেহে লেগেছে মুক্তির আহ্বান। শ্যামার ত্যাগমণ্ডিত প্রেমের রূপ দেখে বজ্রসেনের মনোজগতে একরকম পরিবর্তন ঘটে, এখানে প্রেম সম্বন্ধে একটি উদার প্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হচ্ছে। বজ্রসেন হয়ত তাই শ্যামাকে দয়াময়ী বলে সম্বোধন করে। শ্যামা তাকে বাধা দেয়, অস্বীকার করে সে দয়াময়ী, কারণ এই প্রেম সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, পরাধীনই বটে। শ্যামার অন্তর জানে, সম্পূর্ণ আনন্দের মাঝেও একটি অসম্পূর্ণ দুঃখ-বন্ধনের রূপ বিরাজ করছে; সে এও জানে, কারাপ্রাচীরের শীলার চেয়েও সে কঠিন, দয়াময়ী ত নয়ই বটে, হতেও পারে না; কিন্তু বজ্রসেন চায় শ্যামার ঋণ শোধ করতে, তার প্রেম যে চিরঋণী হয়ে আছে এই দয়াময়ীর কাছে। শ্যামা ও বজ্রসেন পরিপূর্ণরূপে পরস্পরকে দান করতে চায়; চায় নতুন প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে; চায় নিজেদের 'প্রেমের জোয়ারে' ভাসিয়ে দিয়ে 'বাঁধন খুলে' চলতে। তারা ভেসে চলে পাল তুলে প্রবল পবনে নব-জীবনের তরঙ্গের উপর ভর করে, হৃদয় দুলিয়ে পাগল নাবিকের মত দিগ্বিদিগ ভুলে; কিন্তু প্রেমের অকুলে ভাসতে ভাসতে শ্যামার অন্তরে মাঝেমধ্যে শুরু হয় অন্ধ-অজানা আহ্বানের দোলা, দূরে বাজতে থাকে সর্বনাশের বাঁশি, সে যেন নিজগৃহে 'পরবাসী', 'গৃহছাড়া উদাসী'; তাই ত তার একজন সখী শল্যপ্রদানের ছলে জানিয়ে দেয়, 'তোর প্রেমেতে আছে কাঁটা।' শ্যামাকে প্রেমের কাঁটার ক্ষতবিক্ষত কীভাবে রক্তাক্ত করে তাই এই নৃত্যনাটকে প্রকাশ করা হয়েছে, যদিও কেউই এই ক্ষতের কথা মুখ ফুটে বলে না তবুও তা সুস্পষ্টই। অন্যদিকে বজ্রসেন অক্ষয়-মধুর-সুধাময় মিলনের আশায় বিভোর; সে চায় শ্যামাকে প্রাণবেদিতে বসিয়ে প্রেমের পূজায় বরণ করে নিতে আর 'হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকশিল' তাকে জয় করে নিতে; কিন্তু তার মনে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে, সে জানতে চায়– কেমন করে শ্যামা তাকে মুক্ত করেছিল, যদি সে-সত্য জানতে না-পারে তবে সে সেই ঋণ কেমন করে পরিশোধ করবে। কিন্তু শ্যামা তাকে একথা বলতে চায় না, কারণ তার প্রেমে যে কাঁটা আছে, যার বিষ এখনও শেষ হয়নি; তাই সে তার অন্তরের জ্বালা অন্তরেই রাখতে চায়, তা বাইরে প্রকাশ করা যে অনুচিত-অনুপযুক্ত-অসঙ্গত তা সে জানে। তার নীরব থাকা ছাড়া উপায় কী! কিন্তু বজ্রসেন তা পারে না; তাই আবারও সে মিনতি করে, 'কহো বিবরিয়া—জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ।' শ্যামা বলে, 'তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ, আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।' অবশেষে শ্যামাকে বলতেই হয়, সে বলে 'বিবরিয়া'; বলে উত্তীয়ের কথা, তার আহত-প্রেমের গাঁথা, বজ্রসেনকে বাঁচানোর জন্যে সে যে-মিথ্যে চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে নিয়ে প্রাণ সঁপে গেছে প্রহরীর হাতে সেকথাও। বজ্রসেন সবকিছু শোনে, তার মন শ্যামার প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যের অবদানকে মেনে নিতে পারে না, বরং তার মন-আত্মা অভিশাপ দিতে শুরু করে। কিন্তু শ্যামা জানে, সে যে পাপ করেছে তার জন্যে বিধাতার কাছে পাবে নিদারুণ ধিক্কার, কিন্তু সে ত কোনও অপরাধ করেনি বজ্রসেনের কাছে, তবে সে কেন ধিক্কার দেবে। সে ত বজ্রসেনের কাছে চায় দুর্লভ প্রেম, চায় তার ক্ষমা, নতুবা তার জন্য সবই যে অসহ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু তবুও বজ্রসেন পারে না এই মহাপাপের অপরাধী শ্যামাকে ক্ষমা করতে; যদিও সে জানে, এই কলঙ্কিনীর কাছে সে চিরঋণী। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দেয়, ক্রুদ্ধ হয় তার প্রতি, তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে। তারপর বজ্রসেন মিনতিতে সে চলে যায়। শ্যামা চলে গেলেও তার প্রেম বজ্রসেন ভুলতে পারে না, অনুতাপ আর দগ্ধ মনে সে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একসময় সে শ্যামাকে ডাকতে থাকে, কারণ সে ছাড়া তার জীবন নিষ্ফল, নিরস; তার চোখের পাতায় ভেসে ওঠে তাদের সুমধুর কলগুঞ্জনের কথা; তাই তার প্রাণ কেঁদে ওঠে ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে, 'এসো এসো, এসো প্রিয়ে মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।' এই আহ্বানে শ্যামার আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু বজ্রসেন তাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ এখানে শ্যামাকে পাওয়া আসল জিনিশ নয়, নিজেকে প্রেমিকার মাঝে বিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য; নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দিতে না-পারলে তাকে যথার্থ পাওয়া হয় না; এই দান যে প্রেমার্জনের ক্ষেত্রে সত্য আনন্দ; অসত্য-ক্ষুর্ধাত প্রেমই শুধু পারে কাঙালের মত সবকিছু মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে, বস্তুত এরকম প্রেম যে হৃদয়ের নয়, এ-যে মতলবের প্রেম; একে ছিন্ন না করতে পারলে যে পূর্ণসুন্দরপ্রেম আনন্দরূপে প্রকাশ পায় না।

উত্তীয়-শ্যামা-বজ্রসেনের ভালোবাসার ট্র্যাজেক পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতেই 'শ্যামা' নৃত্যনাটকটি সৃষ্টি করেছিলেন। সরল, নিরপরাধ যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের প্রাণত্যাগ আর বজ্রসেনের আহত-প্রেমের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, আক্ষেপই হচ্ছে 'শ্যামা' নৃত্যনাটকের ট্রাজিক– এসবই রূপায়ণ করা ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। বজ্রসেনের প্রেমের জন্যই শ্যামা তার স্বভাববিরোধ পথের পদাঙ্কচারী হয়, আর বজ্রসেন শ্যামার অপব্যহারের প্রতিক্রিয়াজাত মানসিকতা থেকে তাকে ক্ষমা করতে পারে না বলেই অহত-প্রেমের যন্ত্রণায় পুড়তে থাকে। শ্যামা ও বজ্রসেনের জীবন, দুটো জীবনই, হৃদয়বিরোধ কৃত্রিমপথে চলতে গিয়ে নিশোষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে মানুষের অস্তি ত্বরক্ষার সংগ্রামের কথাই ব্যক্ত করেছেন। 'শ্যামা'তে ট্র্যাজেডির উপাদান যেমন আছে, তেমনি আছে প্রেমাস্পদের কাছে ভালোবাসার প্রমাণ দেওয়ার প্রতিজ্ঞাও। 'শ্যামা'র ঘটনা ও সমস্যার দ্রুত পরিণাম রবীন্দ্রনাথের অন্য নৃত্যনাটকে পাওয়া কঠিন। 'শ্যামা'র ঘটনা ও পরিণতি এত দ্রুত হওয়ার কারণ: প্রথমত– 'শ্যামা' নৃত্যনাটকের বৈশিষ্ট্যের জন্য, রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যনাটকটিকে চার-দৃশ্যে ভাগ করে লিখতে বসেছিলেন, প্রতিটি দৃশ্যের বর্ণনাও নাট্যরীতির অনুরূপ; দ্বিতীয়ত– বজ্রসেন-উত্তীয়-শ্যামার চরিত্রের মধ্য-দিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা'র সমুদয় পরিবেশ, ইতিবৃত্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রকাশ করেছেন। গানের অন্তরালে অবস্থান করে ঘটনা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণের প্রকাশভঙ্গি; এখানে একটি বাক্যও অতিরিক্ত নয়, একটি তুলির টানও অহেতুক নয়; রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত, তির্যক-কাব্য ও গানের ক্ষিপ্রতায় চরিত্রগুলোর চেতনা উন্মোচন করেছেন। এসবের মাঝেই বজ্রসেন-উত্তীয়-শ্যামার ভালোবাসা, সমস্যা ও পরিণতি জানা যায়; তারা কেবল পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে অভিঘাত করে না, বুদ্ধিবৃত্তিতেও আবেদন রাখে। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্যনাটকে কোনও চরিত্রকেই বিস্তৃতভাবে পূর্বাপর অঙ্কন করেননি, পাঠক বা দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তাদের পুনর্গঠন করে নিতে হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন যেখানে ক্ষান্তি নেই সেখানে প্রীতি ও শান্তি থাকতে পারে না; এই সত্যই তিনি 'শ্যামা' নৃত্যনাটকে বারবার প্রকাশ করেছেন। উত্তীয়ের প্রেম শ্যামার প্রতি যদিও জয়লাভ করেছে, তবুও বজ্রসেনের যে-কামনা শ্যামাকে ঘিরে সে-প্রেমের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হয়নি, কারণ বজ্রসেন ক্ষমা-সুন্দর অন্তরে, নিজেকে বিসর্জন দিয়ে, শ্যামার প্রেমকে গ্রহণ করতে পারেনি।

সংযোজন: ১০ই ও ১১ই অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' অভিনীত হয়; এতে অভিনয় করেন—মৃণালিনী (বজ্রসেন), নন্দিতা (শ্যামা), আশা ওঝা (উত্তীয়), কেলু নায়ার (প্রহরী) ও অনঙ্গলাল (কোটাল)। আর সখীদের মধ্যে ছিলেন—মমতা, সুকৃতি, অনিতা, সেবা ও সুজাতা। ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' নাটকের নাম পরিবর্তন করে 'শ্যামা' নাম দেন; এতে অভিনয় করেন—কেলু নায়ার (বজ্রসেন), নন্দিতা (শ্যামা), মৃণালিনী (উত্তীয়) ও মাকী (প্রহরী); আর সখীদের মধ্যে ছিলেন—মমতা, সুকৃতি ও উর্ম্মী। ৭ই আগস্ট ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'শ্যামা' অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে।[৪]

[৪] গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য, শান্তিদেব ঘোষ, ১ বৈশাখ ১৩৯০।

চিত্রাঙ্গদা

Chitrangada 1968
Shanti Bose as Arjun

'চিত্রাঙ্গদা'[৫]র মূলবিষয় হচ্ছে আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রকাশ করা। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'য় নরনারীর অন্তরের ভাবানুভূতি ও যৌবন সমস্যাকে আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি ও দেহসম্ভোগ হিশেবে রূপ দিয়েছেন; দেহ ও হৃদয়ের মিলনের মাধ্যমে যে প্রকৃতপ্রেম লাভ করা যায় তারই সন্ধান যেন। মণিপুরের এক রাজকন্যা, চিত্রাঙ্গদা, ছেলেবেলা থেকেই বালক বেশে লালিতপালিত হয়ে আসছে। সে ধুনর্বিদ্যা অর্জন করেছে, বালকের মতই সর্বদা অন্তঃপুরের বাইরে বালক-কাজে নিযুক্ত থাকে, বালক বেশেই সে তার সখীদের সঙ্গে মৃগানুসরণ করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সে পুরুষোচিত শৌর্যবীর্যের চর্চায় তার নারীত্বের কথা ভুলেই গেছে। একদিন সে গভীর অরণ্যে মৃগানুসরণ করছে, মেঘের গুরু গুরু শব্দ চারদিকে, চিত্রবাঘের পদ ও নখের চিহ্নরেখা এখানে-সেখানে, একসময় সে একটি মৃগাগুহার সন্ধান পায়। মৃগয়া মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখীরা যেমনি তাড়া করে অমনি অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠে, 'অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা।/ অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা।/ সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয়!' অর্জুন তখন সত্যপালনের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করে দ্বাদশবর্ষ বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অর্জুনকে দেখে বিভ্রান্ত হয় চিত্রাঙ্গদা। একইসঙ্গে সে অর্জুনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ উপলব্ধি করে। জেগে ওঠে তার বালক-ছদ্মবেশের আড়ালে অন্তর্লীন শাশ্বত নারীর মূর্তিটি। পুরুষের ছদ্মবেশে সে অজুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার বীরত্বকে ম্লান করতে চায় না; চায় শৌর্যবীর্য দিয়ে বীরহৃদয়কে অর্জন করতে। বীরপুরুষই বুঝতে পারবে বীরনারীর মর্যাদা। মোহমুগ্ধ চিত্রাঙ্গদার মনের মধ্যে একরকম স্নিগ্ধানন্দ প্রকাশ পায়। চিরন্তন নারী-হৃদয়ের দৃঢ়তা ও প্রচণ্ড পুরুষের প্রতি যৌবনোচিত আকর্ষণের ইচ্ছায় সে তার বালকবেশ ত্যাগ করে নারীবেশ গ্রহণ করে। নিজেকে অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু অর্জুন ব্রহ্মচর্যের অজুহাতে তাকে বর্জন করে, প্রত্যাখান করে। লাবণ্যহীন চিত্রাঙ্গদা তাকে আকর্ষণ করতে পারে না; প্রেম উপেক্ষিত হয়। চিত্রাঙ্গদা বুঝতে পারে তার রূপহীন রূপই এই প্রেমের সৃষ্টি থেকে তাকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু অর্জুন যদি দেখতে পারত তার হৃদয়ের সুন্দর ও চরিত্রের ঐশ্বর্য তবে তাকে প্রত্যাখান করতে পারত না, বরং তাকে উপযুক্ত সহধর্মিণী বলে গ্রহণ করে নিত। তাই চিত্রাঙ্গদার জেদ চেপে বসে যে-কোনও মূল্যই হোক অর্জুনকে তার অর্জন করতেই হবে। তার অন্তরের সুন্দর প্রকাশ করে অর্জুনের মনকে আকৃষ্ট করতে হবে, শুরু হয় চিত্রাঙ্গদার মনে প্রতীবাদ, তবে এরজন্যে প্রয়োজন সময়ের।

রবীন্দ্রনাথ কখন ও কীভাবে 'চিত্রাঙ্গদা' লেখার চিন্তা করেছিলেন: প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একপত্রে তিনি বলেছেন, 'আমার মস্তিষ্ক যে অবস্থায় আছে সে আর কি বলব! [...] এরই মাঝে মাঝে পাঁচ ছ মিনিট সময় চুরি করে একটা

[৫] বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সালে 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হয়। উৎসর্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'উৎসর্গ।/ স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ পরম কল্যাণীয়েষু।/ তুমি আমাকে তোমার যত্নরচিত চিত্রগুলি/ উপহার দিয়াছ আমি তোমাকে আমার কাব্য/ এবং হে আশীর্ব্বাদ দিলাম।/ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' – চিত্রাঙ্গদা।

লেখা আরম্ভ করেছিলুম—সেটা ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে একটু স্থির হয়ে বোঝবারও সময় পাচ্চিনে—ক্ষণিক অবসরে একরকম শান্ত মুহ্যমান মস্তিষ্কে বিছানায় পড়ে পড়ে নিতান্ত অলসভাবে লিখে যাই—লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে নিদ্রাকর্ষণও হয়। [...] যেটা লিখচি আগে থাকতেই তার নাম দিয়ে রেখেচি অনঙ্গ অশ্রম।'[৬]

'অনঙ্গ-আশ্রম' হচ্ছে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের প্রথম দৃশ্য। এই অপূর্ব 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী[৭] দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। শিলাইদহেই এর রচনা শুরু হয়, তারপর অনেকদিন কেটে যায়, পারিবারিক বহুবিধ কারণে এর আর শেষ করা হয়ে উঠেনি; অবশেষে অর্থাৎ এক বছর পর, সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে, পাণ্ডুয়া হয়ে কটকে এসে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' শেষ করেছিলেন; শেষ করার তারিখ হচ্ছে: কটক, ২৮শে ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ (১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১)। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে তিনি এই পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে শোনানোর জন্য আত্মীয়-বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তারপর তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের উপর 'চিত্রাঙ্গদা'কে ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে। এ-সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্টুডিয়োতেই সেই সময় রবিকা চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকতে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন, [...] চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, 'ছবি দিতে হবে।' আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, 'রাজি আছি।' সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।'[৮] অবনীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'র জন্য ৩৬টা ছবি এঁকেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কীভাবে 'চিত্রাঙ্গদা'র কথা ভেবেছিলেন, এর আভাসও পাওয়া যায় 'চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকায়, তিনি লিখেছেন, 'অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে তার কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফল সম্ভারে। [...] হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যর্থাথ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। [...] এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটা কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটা নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।'[৯] আর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কৃষ্ণ কৃপালনী বলেছেন, '[...] this is a lyrical drama par excellence [...] which is one of Rabindranath's best, and perhaps the only one that is flawless, if anything made by man can be called flawless. Not a line would one like to take away from it [...] where every utterance quivers with lyrical passion held in masterly restraint.'[10] আর এর সমালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন, 'ঘরে ঘরে 'বিদ্যা হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিগ্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। [...] আর রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই।'[১১] বিভিন্ন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ বারবার ভাঙাগড়ার কাজ করেছিলেন; তবে 'রাজা ও রাণী' বা 'বিসর্জন' নাটকের বেলায় যেমনি ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন তেমনি 'চিত্রাঙ্গদা'র ক্ষেত্রে করেননি; তবুও দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) অল্প পরিমান পরিবর্তন করেছিলেন। ১৬ই

[৬] চিঠিপত্র; ৫, ১৩৬-৩৭, পত্র ৩।
[৭] মহাভারতের আদিপর্ব, পঞ্চাশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।
[৮] জোড়াসাঁকোর ধারে; পৃষ্ঠা—১৪৯-৫০, ১৩৭৮।
[৯] সূচনা, চিত্রাঙ্গদা।
[10] Krishna Kripalam, Rabindranath Tagore: A Biography, p143.
[১১] কাব্যে নীতি; সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য ১৩১৬।

শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যটি সাজাদপুর থেকে কালীগ্রামে যাওয়ার পথে বোটে বসেই লিখতে শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বিদায়-অভিশাপ'-এর পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে গবেষক প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, '[...] 'বিদায়-অভিশাপ'-এর পাণ্ডুলিপিটি [...] ৩৪ পৃষ্ঠার একটা ছোটো নোটবুক-জাতীয় খাতা। প্রথম ২টি পৃষ্ঠা সাদা—২য় পৃষ্ঠায় হাঁটুর মধ্যে মুখ-গুঁজে পিছন-ফিরে বসা পুরুষমূর্তির কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার পেনসিল-স্কেচ আছে। বাকি পৃষ্ঠাগুলি হালকা নীল রুল টানা—প্রতি পৃষ্ঠায় ২২টি রুল আছে। খাতার ডান দিকের পৃষ্ঠাগুলিতেই লেখা হয়েছে, প্রয়োজনমতো দীর্ঘ সংযোজন করা হয়েছে বাঁদিকের পৃষ্ঠায়—রচনা-শেষে তারিখটি কালিতে লেখা, তাছাড়া সমস্ত রচনাটিই পেনসিলে লিখিত। ৩২৮ ছত্রের সমিল প্রবহমান পয়ারে লেখা এই কাব্যনাট্যের পাণ্ডুলিপিতে শব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অসন্তোষ সুস্পষ্ট—কাটাকাটির পরিমাণ তাই স্বভাবতই বেশি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়ার পর আর কোনো পরিবর্তন হয়নি—সাধনা ও রচনাবলী-র পাঠে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই।'[১২] আর সুরেশ সমাজপতি লিখেছেন, '[...] 'বিদায়-অভিশাপ' [...] একটা দীর্ঘ কবিতা, দুইটি মাত্র চরিত্র ও বিদায়ের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রথায় রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক ও নায়িকা। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি, বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া দৃপ্ত হইয়াছি। [...] রবীন্দ্র বাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলাকল্পিত যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটা বর্ণনা ও চিত্র, যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশেষণশক্তিও প্রশংসনীয় এবং উপভোগের যোগ্য।'[১৩] কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু লিখেছেন, '[...] রবিবাবু মিত্রাক্ষরের সহিত অমিত্রাক্ষরের পদ্ধতি মিশাইয়া আজ কাল যেরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রীতিপ্রদ। [...] বর্ত্তমান কবিতায় 'ধর্ম্ম জানে প্রতারণা করি নাই' ইত্যাদি গদ্যময় পংক্তি এবং যতি ও শব্দবিন্যাসের দোষ অনেক স্থলে দেখিলাম। কিন্তু ঠাকুর-কবির স্বভাবসুলভ সুন্দর বর্ণনা ও সহজ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি পড়িতে বিরক্তিবোধ হয় না। ব্রাহ্মণতনয় কচ স্বার্থময় প্রেমের উপর কর্ত্তব্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবং দেবযানীর কঠোর অভিশাপের বিনিময়ে যে উদার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতার বর্ণনীয়। উদ্দেশ্যের জন্য যতটুকুর প্রয়োজন, কবিতাটিকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইল। কচের চরিত্র মহাভারত হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছে।'[১৪]

প্রতিমা দেবী ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছিলেন। প্রতিমা দেবীর লিখিত পরিকল্পনাটি রবীন্দ্রনাথ পেয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার বাসনায় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেই গান রচনার জন্যে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রচনা করেছিলেন: প্রথম দৃশ্যের জন্যে 'গহনে গহনে যারে তোরা', 'এখন করব কি বল', 'ওরে ঝড় নেমে আয়', 'শোন তোরা শোন ও 'বঁধু, কোন মায়া লাগল চোখে'; দ্বিতীয় দৃশ্যের জন্যে 'দে লো সখী দে, পরাইয়ে গলে', 'আজি এত শোভা কেন', 'সখী বহে গেল বেলা' ও 'বাকি আমি রাখব না কিছুই'; তৃতীয় দৃশ্যের জন্যে 'মোরা জলে স্থলে কত ছলে'; চতুর্থ দৃশ্যের জন্যে 'মরিলো মরি আমায় বাঁশিতে', 'সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে', 'দূরের বন্ধু সুরের দু'তীরে', 'কে ডাকে আমি কভু ফিরে নাহি' ও 'বসন্তে ফুল গাঁথলো'; আর পঞ্চম দৃশ্যের জন্যে 'জীবনে আজ কি প্রথম এল', 'আমার পরান যাহা চয়ে', 'কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে'। তারপর রবীন্দ্রনাথ একটু রদবদল করে প্রতিমা দেবীর পরিকল্পনাকে সাজিয়েছিলেন ছয়টি দৃশ্যে। একটি রূপহীন নারীর প্রতিবাদ প্রকাশ করতেই রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' লিখেছিলেন। একজন রূপহীন নারী কেমন করে একজন সুপুরুষের মন কেড়ে নেয় তাই প্রকাশ পায় 'চিত্রাঙ্গদা'য়। প্রকাশ পায় কীভাবে একজন নারীবিদ্রোহী পুরুষ বন্দী হন চিত্রাঙ্গদার ভুজপাশে। 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধে আলোকপাত করার সময় মনে রাখতে হবে যে, এতে ভাষার কলাকৌশলের কোনও ঝামেলা নেই; এর ভাষা হচ্ছে সুর ও তাল; এর প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে নৃত্য, দেহরেখায় ফুটে ওঠে ভাব। এই ভাবের মাঝেই খেলতে থাকে ছবির খেলা– রঙ ও আলো। এছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষত এ যখন নাটকীয় রাজ্যে পৌঁছে যায়। কবি জানতে নাচের সময় দেহের রেখা খুব নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করতে হয়– কোথাও যেন কোনও অবান্তর ভঙ্গি ফুটে না ওঠে; হলে

[১২] রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৯৪।
[১৩] মাসিক সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০০।
[১৪] সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি, সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য ১৩১০।

তালের সঙ্গে ভঙ্গির সঙ্গতি রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেরকমই পার্থক্য।[১৫]

ফিরে আসা যাক 'চিত্রাঙ্গদা'র আখ্যাবিষয়টির মাঝে। 'চিত্রাঙ্গদা' হচ্ছে ছোট ছোট কবিতা ও তার মাঝে মাঝে মূল ঘটনার সূত্র ধরে গান ও নাচ। বেলা বয়ে চলেছে, কাজল মেঘ ঘনাচ্ছে, বায়ু সজল হচ্ছে, হরিণ ছুটছে বেণুবণচ্ছায়ে। সঙ্গীরা রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করে, 'কোন বনে যাব শিকারে।' কিন্তু চিত্রাঙ্গদার জীবন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে, সে কোনও বনেই যেতে চায় না, ধনুঃশর ফেলে দেয়, ফেলে দেয় বাহুবল, নিজেকে ভাসিয়ে দেয় পৌরুষসাধনায়। সে ধারণ করে বসন্তের ব্যাকুলযৌবনের আবরণবন্ধনবিহীন মল্লিকা, একইসঙ্গে নিজের উপর ধিক্কার প্রকাশ করে; কারণ অর্জুনের পরিচয় পাওয়ার পর থেকে তার মন এক নতুন আলোতে বিভোর। সে চায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতে অর্জুনের প্রেমের জোয়ারে, সকল ভাবনাকে ডুবিয়ে দিয়ে। যে-কোনও মূল্যেই হোক অর্জুনকে তার চাই চাই। তাই সে চায় নিজেকে নূতন আভরণে নবলাবণ্যে ধারণ করতে। রূপহীন চিত্রাঙ্গদা ব্যর্থ বাসনার দাহকে নির্বাণ করার জন্য শেষপর্যন্ত মদনের শরণপন্ন হয়। পূজা নিবেদন করে। মদন মণিপুরনৃপদুহিতার কথা শোনেন। শোনেন অভাগীরে কী করে অর্জুন ব্রহ্মচারী ফেরিয়ে দিয়েছে। সব শোনে তিনি বরদান করেন, বলেন, 'কান্তহৃদয়বিজয়ে' চিত্রাঙ্গদা হবে জয়ী। মদন এক বছরের জন্য চিত্রাঙ্গদাকে অপূর্ব রূপসৌন্দর্য ধারণ করার বরপ্রদান করেন। মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা নূতন রূপ লাভ করে; তার অঙ্গে অঙ্গে নূতন বাঁশি বাজতে থাকে, মাধুরী মেশানো সুগন্ধ বাতাস যেন। জলের ছায়ায় নিজের ছবি দেখে চিত্রাঙ্গদা চমকে ওঠে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে ধরা দেয়। অর্জুন দেখতে পায় চিত্রাঙ্গদার মাঝে 'সূবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া'। এই নারী যেন সকল দৈন্যের মহাবসান। সে যেন বিশ্ববিধাতার সমস্ত গর্ব। অর্জুন তাকে আহ্বান করে। চিত্রাঙ্গদা সাড়া দেয়। শুরু হয় অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমের সম্পর্ক; কিন্তু এই প্রেমের উদ্দামতা এভাবে আর চলতে পারে না। সৃষ্টি হয় দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও ভাবান্তর। অর্জুনের মনে এই প্রেম এনে দেয় 'দহনজ্বালা', বিতৃষ্ণার ভাব। বনের মধ্যে নামগোত্রহীন এক নারীর সঙ্গে প্রেমলীলায় মত্ত হয়ে তার মন তৃপ্তি পেতে চায় না। আলস্য-সুখ-স্বপ্নে তার দিন কাটে থাকে, সে অস্বস্তি বোধ করে। অর্জুনের মোহভঙ্গের সূচনা ঘটে। তাই সে চায় চিত্রাঙ্গদার নাম-পরিচয় জানতে; স্নেহে যে মাতা, বীর্যে যে পুরুষ, সেই নারী অবশ্যই স্নেহপ্রেমদয়াময়ী ও বীর্যবতী। এই স্নেহপ্রেমদয়াময়ী ও বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদাকে তার কাছে প্রকাশ করতেই হবে। অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদা চায় এই প্রেম রেখে যাক 'স্বপ্নের রেশ', তাই 'চিত্রাঙ্গদা'য় ফুটে উঠেছে বিরহের সুর। মদনের বরে নবরূপের আবরণে চিত্রাঙ্গদা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে; কারণ চিত্রাঙ্গদার মন চায় তাকে যেন অর্জুন ভালোবাসে তার প্রকৃতরূপে, ছদ্মরূপাবরণে নয়। এ-সম্বন্ধে প্রথমনাথ বিশী বলেছেন, 'চিত্রাঙ্গদার দুইটি সত্তা : বাহিরে সে রূপময়ী, অন্তরে সে প্রেমময়ী; বাহিরের রূপ দেবদত্ত, অন্তরের প্রেম স্বাভাবিক। অর্জুন যাহাতে আকৃষ্ট চিত্রাঙ্গদার তাহা সত্য রূপ নয়, প্রেমময়ী ত্রাসমিশ্র ঈর্ষার সঙ্গে দেখিতেছে অজুর্নের হৃদয়ের অর্ঘ্য ঐ মিথ্যার পদপ্রান্তে পড়িতেছে।'[১৬] তাই তো চিত্রাঙ্গদার অনেক সাধনায় অর্জিত প্রেমে একটা অতৃপ্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করার জন্যই যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, 'কৃত্রিম দেহ-রূপের পাত্রে প্রেমকে আহরণ করার যন্ত্রণা প্রথমাবধি চিত্রাঙ্গদার মর্মলগ্ন। [...] যে সম্ভোগ প্রেমের আধারে সমগ্র ব্যক্তিত্বের রহস্যকেই আস্বাদন করতে পারে না– কেবল দেহের প্রাণহীন তটে কামনার্ত রুক্ষতায় নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তার অনিবার্য অন্তর্দাহটুকুও চিত্রাঙ্গদার আর্তিতে প্রচ্ছন্ন।'[১৭] নারী হিশেবে চিত্রাঙ্গদা চায় সে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে। এই সত্য প্রকাশে যদি অর্জুন তাকে আর ভালো নাও বাসে তাতেও তার কিছু যায় আসে না। সে চায় ছদ্মরূপিনীর চেয়ে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠ হতে। এ অংশে রবীন্দ্রনাথ একজন নারীর মানসিক প্রতিক্রিয়া ও স্বতন্ত্রবোধের প্রকাশ করেন। তাই ত চিত্রাঙ্গদা বলে, 'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।/ নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।'

[১৫] চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৩।
[১৬] রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১৯৮৮।
[১৭] বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১৯৮১।

শাপমোচন

Rabindranath Tagore's Sap Mochan by Nrityangan.
Shanti Bose & Aloknanda Roy.

'শাপমোচন'-এর মূলবিষয়টি হচ্ছে মোহ ও প্রেমের দ্বন্দ্ব। অন্তরের মঙ্গলভাবনার উপর প্রেম প্রতিষ্ঠিত হলে জীবন সার্থক হয়; কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষা, প্রেমলিপ্সা, প্রেমাকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেম কখনও সফল হয় না, জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, নিজের মধ্যে সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জেগে উঠে না।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি রচিত হয়। প্রতিমা দেবী বলেছেন, '[...] 'শাপমোচন'-এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় য়ুনিভার্সিটি ছাত্রদের অনুরোধে তিনি 'শাপমোচন'-এর কথাবস্তু লিখেছিলেন এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে স্টুডেন্টস্ ডে'-তে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরণ ক'রে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে মূক-অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল।'[১৮] প্রথম মঞ্চায়ন করা হয় ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, জোড়াসাঁকোতে। ১৫ই পৌষ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাত্রছাত্রী-উৎসবপরিষৎ'-কর্তৃক 'শাপমোচন' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ-সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় এর কথিকা অংশটি প্রকাশিত হয়, আর আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে 'পুনশ্চ' গ্রন্থে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'[১৯] নাটকটিকে অবলম্বন করে 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যটি সৃষ্টি করলেও 'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ গদ্য-কবিতা এ-নাট্যের মূল গাঁথনি। প্রসঙ্গত, 'রাজা' নাটকটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর মূল তত্ত্বটি হচ্ছে: পরমাত্মার আনন্দ জীবাত্মার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন; তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। [...] এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা।'[২০] এ নাটকের রাজা হচ্ছেন 'পরমাত্মা' ও সুদর্শনা হচ্ছেন 'জীবাত্মা'র প্রতীক। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে 'রাজা'কে অভিনয়যোগ্য ও পরিবর্তন করে, সংক্ষিপ্ত আঁকারে রবীন্দ্রনাথ যে নাটকটি প্রকাশ করেছিলেন তার নাম দেন 'অরূপরতন'।[২১] 'রাজা' বা 'অরূপরতন' এক বৌদ্ধাখ্যান অবলম্বনে লিখিত, 'শাপমোচন'-এর ভূমিকায় তা প্রথম প্রকাশ পায়, বৌদ্ধাখ্যানটি হচ্ছে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত 'দি সাংস্কৃত বোদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল' গ্রন্থের একটি গল্প।[২২]

---

[১৮] নৃত্য, প্রতিমা দেবী।
[১৯] যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্ব করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত– ভূমিকা, শাপমোচন, ১৩৩১।
[২০] শান্তিনিকেতন, পরিণয়, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[২১] রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নূতন করিয়া পুনর্লিখিত– অরূপরতন, ১৩২৬।
[22] 'Once upon a time, there reigned at Varanasi, a king named Subandhu. All of a sudden, his bed-chamber miraculously turned into a sugarcane plantation. One cane among the rest was so refreshing to the eye that the king called some astrologer in, to ascertain

সত্য-প্রেমের সাধনা কখনই বাইরের রূপের সাধনা হতে পারে না। এ হতে হবে অন্তররূপেরই সাধনা। সমস্ত রূপের ভেতর দিয়ে কুরূপের বন্ধনকে অতিক্রম করে যে ধ্রুবসত্যের সন্ধান মিলে তাই হচ্ছে প্রেমের সম্বন্ধ। একটি নির্দিষ্ট রূপের সীমানাকে অতিক্রম করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'শাপমোচন' রচনা করেছিলেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথ কুরূপকে সুরূপের মাঝে পেতে গিয়ে কুশ্রী করে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নায়ককে, 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যটি[২৩] থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পত্রখানি' বলে বিষাদের অশ্রুজলে মধুশ্রী বিদায় নেয়। তারপর শাপগ্রস্ত গীতনায়কের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে 'গান্ধার' রাজগৃহে 'অরুণেশ্বর' নামে তার জন্ম হয়, আর মধুশ্রী জন্ম নেয় 'কমলিকা' নামে 'মদ্র' রাজকুলে। স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সঙ্গে করে এনেছিল অরুণেশ্বর এখন 'তারি বাঁশি বাজে' তার হিয়া ভরে, যার বাণী অস্পষ্ট, তবুও কানে যেন বাজে সবসময়। রাতে তার ঘুম আসে না; 'জাগরণে যায় বিভাবরী'। অন্তরভরা বেদনাতে আঁখিপাত জলে ছলোছলো করে। খুঁজে বেড়ায় এক কঠিন তৃষ্ণাকে, তাই ত ফেলে আসা স্মৃতিমালার দোলা লাগে তার মনে।

একদিন কমলিকার ছবি এসে পৌঁছে গান্ধার রাজের অন্তঃপুরে, অরুণেশ্বরের কাছে। মনে হয় যাকে এতদিন খুঁজছিল, যার আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিল তাই যেন ফিরে এসে ধরা দিয়েছে এক অপরূপ স্বপ্নরূপে। ছবি দেখে সে মনে মনে ভাবে, 'নয়নসম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।' অরুণেশ্বরের কাছে এ শুধু ছবি নয়, অন্তরের মিলনও বটে; তাই চিত্তরূপনীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে সে, 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে [...] বরণমালা।' কমলিকার কাছে সে চিঠি গিয়ে পৌঁছে। অচেনা-অজানার আহ্বানে রাজকন্যার মন হয় উতাল। মনের

---

what was in it. They predicted that a son was to be born to the king from that cane. In time the cane swelled to the size of a bamboo. One morning a boy issued forth from the sugarcane, and he was named Ikashaku or the sugarcane-born. The boy was nourished by the chief lady of the royal seraglio. On the death of Subandhu, Ikshaku became king. He had many queens, of whom Alinda was the chief. Even to an advanced age the king was childless. He consulted holy men for granting a child. Their advice was to open the seraglio thrice every fortnight to the public use. All, except Alinda, took advantage of this liberty, and, leaving the palace at night, went wherever they liked. One of Subandhu's near relations held the post of Indra in the thirty-third heaven. Indignation at the unworthy and shameful conduct of Ikshaku, he transformed himself into an old decrepit dirty Brahman, suffering from a loathsome cough. He managed to throw himself at the royal presence, and begged to have a queen for dalliance. The king gave him the choice of his seraglio, and he selected Alinda. The Brahman dragged the chief queen of the palace, in spite of her stubborn opposition, to an old dilapidated building in the suburb. Alinda had to wash his feet, and to stand before him in complete nudity. But she would never consent to prostitution her body. In the morning Indra threw off his disguise, expressed his satisfaction at her conduct, and rewarded her firmness by placing some drugs in her hands. 'This will', said he, 'remove your barrenness. I grant this boom in accordance with your own desire. Dissolved this powder into water, and take the solution. Your son will be active and energetic, but since you did not respond to my loving call, he will be like ugliness personified'. Five hundred children were born to the king. The ugly child of Alinda was named simply Kusaor, as some say, Suddhakusa. He was no favourite with the king, who made several attempts to disinherit him. / Mahendraka, the tribal king of Bhadrakasat in Kanyakubja, had a very beautiful daughter. Alinda immediately after Kusa's accession, set a negotiation on foot of her son's marriage to that Princess. The match was soon settled. The unptials were celebrated with great pomp by proxy at Kanyakubja. But Alinda was apprehensive lest her fair daughter-in-law would committee suicide at the sight of so deformed a husband. She, therefore, prepared rooms underground where, under the plea of family customs, she placed the young couple. No light was admitted into the rooms. The couple enjoyed their honeymoon in the dark. But Sudarsana, the princess, grew impatient to see her beloved husband, and urged her mother-in-law to bring about and interview in the light. Alinda, to avoid Sudarsana seeing the ugly husband, made one of her step-sons personate Kusa on the throne, while the real Kusa with his thick lips, corpulent belly, deformed head, held the royal umbrella. Sudarsana was well pleased with her supposed husband, but she expressed her indignation at so black and ugly a person being allowed to hold the parasol. On one occasion when walking in the royal park she fled from him as from a monster. / But in a short time, her mistake was corrected. At a great conflagration of the city the elephant park was saved, simply by the activity of the king. He was for some time in every body's mouth. They described him as very black, with large red eyes, etc. Sudarsana then found out her error. She learned, to her great surprise and grief, that the monster at the park was her real husband. She instantly begged the permission of her mother-in-law to proceed to Kanyakubja. The permission was granted, and she set out for Kanyakubja to hide her shame. / The king, unable to bear the separation, appointed one of his half brothers as regent, and proceeded himself to the north with a vina in his hand. On his arrival at Kanyakubja his first measure was to apprise Sudarsana of his presence in the city. By his skill in the culinary art, he soon got himself appointed at the royal kitchen. There in private he tried to persuade his refractory wife, but to no purpose. She was inexorable. / In the meanwhile, the scandal of Sudarsana's leaving, and in a way divorcing, her husband spread far and wide. Seven feudatories of the king of Kanyakubja offered to marry her. But their offers were indignantly rejected by the king. They made a common cause with one another and advanced to size the capital. The king in wrath scolded his refractory daughter, and threatened to cut her into seven pieces for these seven rebels, if he got worsted in the coming conflict. Sudarsana, trembling with fear at so terrible a threat, had now recourse to her almost divorced husband at the kitchen. He promised to save her, and to fight her father's cause. The king was now told of his son-in-law's appointment as a cook. He hastened to receive him, and, heaping honours upon honours on him made up for all his former neglect. The hero advanced on an elephant towards his enemies, and by a shout at the onset so quailed their spirit that they surrendered themselves his captives [...] After enjoying his triumph for a few days at Kanyakubja, Kusa set out in the company of his humbled wife for his own kingdom. On his way, he looked at his own image reflected in a glossy brook, and was so much disgusted at his deformity that he wanted to drown himself. But just at that time Indra manifested himself before him, and presented him a garland set with the rare jewel called Jyotirasa. 'Put this on, and it will make you', said Indra, 'the most beautiful man on earth. When you wish to assume your own form, cover this with your cloths and your beauty will be hidden'. Kusa put on the jewel, and Sudarsana was transported with delight, when she found her husband blessed with a celestial form.' – The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882.

[23] গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভায় গীতনায়কদের অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সৌরসেনের বিরহচিত্ত ছিল উৎকণ্ঠিত। অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে, নৃত্যে উর্বশীর শমে পড়ল বাধা, ইন্দ্রাণীর কপাল উঠল রাঙা হয়ে। [...] স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধাররাজগৃহে। / মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল, বললে, "ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ, দেবী, গতি হোক একই লোকে আমাদের, একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।"/ শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন। ইন্দ্র বললেন, "তথাস্ত, যাও মর্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দ্রঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।" – শাপমোচন।

মাঝে বাজতে থাকে দূর-বাণীর পরশ। তার মুক্ত কেশে লাগে 'ক্লান্ত গমন পান্থ হাওয়া'। একদিন অরুণেশ্বর কমলিকার সঙ্গে 'বিবাহ-প্রস্তাব' পাঠায়। প্রস্তাব পেয়ে মদ্র রাজা বলেন, 'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।' কমলিকার মনও এক অদৃশ্য সুন্দরের মোহস্বপ্নে আকৃষ্ট হয়। শুভলগ্ন ধার্য করা হয় চৈত্রপূর্ণিমার পূর্ণতিথিতে। দেখতে দেখতে শুভলগ্নের বাঁশি বেজে ওঠে। রাজ-হাতির পিঠে রত্নাসনে অরুণেশ্বরের 'অশ্রুত আহ্বান' সঙ্গে নিয়ে প্রতিনিধি হয়ে আসে তার 'বক্ষোবিহারিণী' বীণা। বীণাই রাজার প্রতীক। বীণাকে কোনও নির্দিষ্ট রূপের সীমানায় আবদ্ধ করা যায় না। একে কেউ মঙ্গল-অমঙ্গলের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে পারে না। দেহলিপ্সার অনুভূতিতে সে অনধিগম্য। এ বাস্তব-জীবনের প্রেমের সার্থকতার প্রতীক। তাই সে রাজার অন্তঃরূপের প্রতীক। এখানে দুটো সত্য প্রকাশ পেয়েছে: এক— প্রেমের দাবী কখনও বাইরের সুরূপকে উপেক্ষা করতে পারে না, তবে প্রেম বাইরের কুরূপকেও অন্তরের সুরূপ বলে মেনে নিতে পারে না; যদি গ্রহণ বা অনুভব করতে পারে তাহলে তা হবে অনেক সাধনার চেষ্টায়। দুই— বাইরের রূপের দাবী থাকলেও প্রেমের সার্থকতা অন্তরের রসই আসল। তারপর প্রেমরস অন্তর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, তবে অন্তরের দৈন্য বা রসহীনতা প্রেমকে নামিয়ে আনতে পারে নীচে দেহলালসায়, প্রেমলিপ্সায়; যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে গূঢ় অতৃপ্তিই।

অরুণেশ্বর নিজগৃহে, বধূর দৃষ্টির আড়ালে, একলা বসে থাকে। তার বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলে চলে। কুহেলিকার ভেতর থেকে কেবলই তার মনে পড়ে, লোকান্তরে এরকম এক পূর্ণিমার রাতে কার সঙ্গে সে যেন এক দোলায় দুলে ছিল? তাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই গৃহে রাজার মন গুঞ্জরণ করে ওঠে, 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে।'

চারদিক মুখরিত। বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি, উঁলুধ্বনি; তারপর বিয়ে হয়, মালাবদল হয়, কিন্তু সবই হয় বীণার সঙ্গে। কমলিকা প্রতীককে বরণ করে নেয়, আর অরুণেশ্বরকে গ্রহণ করে তার তনমনপ্রাণে, তার ধ্যানে, কিন্তু তার কল্পনায় সে-পুরুষ থেকে যায় সে যে বীরোচিত, দেহসৌষ্ঠবে অনুপম। সংকর্ণী রূপমোহের আকাঙ্ক্ষায় কুশ্রী রাজাকে সে সুশ্রীর বাঁধনে বাঁধতে চায়; তাই তো দেবতার অভিশাপে যে অরুণেশ্বর অসহ্য কুশ্রী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সে থেকে যায় তার ধারণা ও সন্দেহের বাইরে। তারপর, কমলিকা পৌঁছে পতিগৃহে। রাজগৃহে প্রদীপ জ্বলে না। রাজা অন্ধকারের মধ্যেই নিজেকে ধরে রেখে রাণীকে ধরা দেয়, এতে কমলিকার দেহরূপভোগের তৃষ্ণা মেটে না; বরং তার মনে জেগে ওঠে সংশয় ও দ্বিধা, মর্মযন্ত্রণার দাহ যেন; তাই সে এক-রাতে রাজাকে অনুরোধ করে দেখা দিতে। রাজার কাছে এ-অনুরোধ মনে হয়, অসত্য ও অকল্যাণময় পথের সন্ধান, প্রেমসার্থকতা লাভের পথের বাধা। সে জানে, প্রেমের দাবী একদিকে যেমন দেহের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়, তেমনি তা দেহের অণুতে অণুতে প্রবেশ করে অন্তরের মাধুর্যতা দিয়ে সিক্ত করতে হয়। অরুণেশ্বরের দেহের দাবী জানানোর তার কোনও উপায় নেই; কারণ, তার বাইরের রূপ হচ্ছে কুশ্রী। তার যা-কিছু আছে সবই যে অন্তরের; আর তার অন্তরের সেই নির্ঝরিণী রস খুবই করুণ, খুবই গাঢ়। অন্তরের সাধনার প্রতীক যে বীণা তাতে আবার সুর বেজে ওঠে। রাজা চায় 'ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে' কমলিকার অন্তর-রসের ঝরণাধারায় প্রবাহিত হতে। চায় দেহের কুশ্রী-ত্রুটি অন্তরের ঐশ্বর্যে, কুশ্রীর পরম বেদনাতেই সুন্দরের আহ্বানে, সংশোধন করে নিতে। তাই রাজা উত্তর দেয়-যে, প্রথমে অন্তরের সন্ধান করে নিতে তারপর বাইর দেখার 'দিন আসবে'।

কুরূপের বেদনা প্রেমের ক্ষেত্রে কল্পনার পাহাড় নয়; এ-যে নিতান্তই বাস্তব, জীবনের অক্ষমতার অংশই তো বটে! আবার প্রেমের পূজায় দেহরূপ অন্তররূপের সঙ্গে মিলানো যায় না। প্রেমের ক্ষেত্রে অপূর্ণ অর্ঘ্যই নিবেদন করতে হয়। এই ভাবচিন্তা অসত্য নয়, তবে এ-ভাবের স্থান প্রেমের প্রাতদ্যহিক ক্ষেত্রে নিতান্তই বিরল। তবে অরুণেশ্বরের বেদনা করুণাও না, অপূর্ণতার বেদনাও না; এ-যেন কুরূপের বেদনা, প্রেমের উপর দাবী রাখার দুর্বলতার বেদনা। অরুণেশ্বরের ভরসা শুধু তার কমলিকার প্রেমের ঔদার্যের উপর, প্রেমের নব-দৃষ্টির দয়ার উপর। যতদিন না কমলিকার প্রেম তার আপন মনে গভীর হয়ে উদয় হয়, কুরূপকে সুরূপ বলে অনুভব করে, ততদিন অরুণেশ্বরের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে, তাই সে অন্ধকারে বসে শুধু বীণা বাজিয়ে চলে। কমলিকার অন্তর বিরহকান্নায়, মিলনের বাসনায় বাঁধা। প্রিয়তমকে নাগালের কাছে পেয়েও যেন নাগাল পায় না। হৃদয়ে নাড়া ঠিকই দেয়, কিন্তু প্রহর কেটে যায় সাড়া পায় না; তবুও তার দুচোখ একটি বারের মত রাজাকে

দেখতে চায়; সে চায় না প্রিয়দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতে। কমলিকার ঐকান্তিক অনুরোধ-মিনতি, কেন তাকে প্রিয়দর্শন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কেন তাকে বেঁধে রাখা হচ্ছে অদৃশ্য ডোরে? রাজার অন্তরের করুণরসানুভূতি যেমনি বাইরে ঝরে বীণার তারে ঝঙ্কার তুলে, তেমনি অনুপম নৃত্যের তরঙ্গের ছন্দেও প্রকাশ পায়; তাই অভিমানী কমলিকার দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানায়, আমন্ত্রণ জানায় 'চৈত্র-সংক্রান্তী'তে 'নাগকেশরের বনে' বন্ধুদের সঙ্গে তার নাচ দেখার জন্য। কমলিকা জানতে চায়, কী করে সে রাজাকে চিনতে পারবে? রাজা জানিয়ে দেয় যেমনি খুশি কল্পনা করে নিতে। অন্ধকারে বসে বসে রাজা বীণার মাধ্যমে কমলিকাকে বর প্রদক্ষিণ করে, যা তার মর্তদেহে এসেছিল নির্বাসন-সঙ্গিনী হয়ে। আর 'চৈত্র-সংক্রান্তী'তে নৃত্যের মাধ্যে কুরূপের বেদনাই যেন প্রকাশিত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তীর রাতে আবার মিলন হয় তাদের। কমলিকা প্রশংসা করে সেই নাচের, যা ছিল 'মঞ্জুরিত শালতরু-শ্রেণীতে বসন্তের বাতাসের অধৈর্য্য', যেন 'চন্দ্রলোকে শুক্লপক্ষে' লেগেছিল 'তুফান'; তারপরই কমলিকা প্রশ্ন করে, 'একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ' করল? কী গুণে সে পেয়েছিল সেখানে 'প্রবেশের অধিকার'? নিশীত রাতে সমুদ্রে জোয়ার এলে ঢেউগুলি যেমনি তটভূমিকে তছনছ করে দেয়, তেমনি কমলিকার কথায় রাজার চোখ-দুটো অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে যায়। রাজা কমলিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্য্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু তার লজ্জাকে শান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপের স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আর্বিভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।'[২৪] কমলিকা রূপমোহে আকৃষ্ট হয়ে তা মনতে পারে না। রসবিকৃতির পীড়া সে সইতে পারে না। কিন্তু রাজা জানে, কমলিকাকে একদিন তা সইতে হবে; কারণ 'কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরেরই স্বার্থকতা' যে।[২৫] ঘটনা প্রেক্ষিতে কমলিকা বলল, 'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝিনে। ঐ শোনো, ঊষার প্রথম কোকিলের ডাক। অন্ধকারের মধ্যে তার আলোর অনুভূতি। আজ সূর্য্যদোয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলেম।'[২৬] অরুণেশ্বর জানে সুরূপকে বাদ দিয়ে প্রেমের ঔদার্য অসম্ভব। কুরূপকে সুরূপ বলে জেনে বা মেনে নিলে প্রেম কেবল অন্তর-রসে সার্থক হয় না। সাধনার বলে বা কল্পনার সৃষ্টিতে কুরূপের বাধা পেরিয়ে গেলে জীবনের প্রেমকেও ফেলে চলে যেতে হয়, সেখানে প্রেমের দেহান্তর ঘটে, বিশুদ্ধ আত্মিক প্রেমের উপলব্ধি-লাভ হতে পারে; কিন্তু মানব জীবনের প্রেম সেখানে উত্তীর্ণ হয় না। রাজার একমাত্র ভরসা প্রেমের নবদৃষ্টির উপর। এ-দৃষ্টিতে প্রেম কুরূপকে সুরূপ বলে অনুভব করে, কল্পনার মরীচিকায় নয়, অনুভবের নবস্পর্শে সুরূপ বলে ভালোবেসে। বধূর প্রেমে এ-নবদৃষ্টি উন্মেষের জন্য অরুণেশ্বরের অপেক্ষা, কিন্তু এরইমধ্যে অন্ধকার ঘরে জ্বলে ওঠে আলো। আবরণ খুলে যায়, দেখা হয় দুজন দুজনে। রাজার কুরূপ দেখে কমলিকার স্বপ্ন ও কল্পনা ভেঙে যায়। রাজার এই রূপ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কমলিকা 'কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা' বলতে বলতে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। মিলনপিয়াসী রাজা তার উৎসারিত ভালোবাসার আশ্বাসে বলে, 'না যেয়ো না, যেয়ো না।' কমলিকার মনে প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। রাজার ডাকে সে সাড়া দেয় না। স্বামীর কুৎসিত কুরূপের প্রতিই যেন তার ঘৃণা। সুরূপের প্রতি আসক্তিবোধ। একদিকে স্বামীর প্রতি বিরূপতায় লজ্জাও তার মনে উদয় হয়, অন্যদিকে রূপের প্রতি তীব্র নেশায় অশুচিতাবোধও। তাই কমলিকা চলে যায় বহুদূরে। অবাস্তব সৌন্দর্যের পেছনেই যেন সে ছুটে চলে। মানুষের অন্তরাত্মাকে যখন অসুন্দর আচ্ছন্ন করে তুলে, তখন অনন্ত সৌন্দর্যময় ও প্রেমময়ের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক মিলন ঘটে না, তাই কমলিকা বনের মধ্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেখানে চলে যায়। রাত যখন দু'প্রহর তখন কমলিকা শুনতে পায় বীণার আর্ত-ধ্বনি, আর্ত-রাগিণী। সেই সুর তার আজীবনের চেনা। চিরবিরহের সুর যেন। তার বুকের মধ্যে অশ্রু উচ্ছ্বলে ওঠে। প্রবল আত্মগ্লানিতেই যেন তার মন জর্জরিত। সুরূপের নেশায় সে আহত যেন; তবুও রাতের-পর-রাত অতিবাহিত হতে থাকে। শুরু হয় চরম অনুশোচনার পালা। সাধনা। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে কমিলকার চেতনার উদ্বোধন ঘটে, সিদ্ধিলাভ হয়। সম্পূর্ণ না-হলেও সে প্রেমের দৃষ্টিতে কুরূপকে সুরূপ বলে অনুভব করতে থাকে; দেখতে দেখতে কমলিকার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হয়।

[২৪] শাপমোচন।
[২৫] শাপমোচন।
[২৬] শাপমোচন।

সে বুঝতে পারে, পরম প্রিয়তম স্বামীর স্বরূপটি, প্রেম সার্থক হয়, এই হচ্ছে কমলিকার নবদৃষ্টি, একে বলা যায় প্রেমদৃষ্টি, মোহদৃষ্টি অবশ্যই নয়, এই নবদৃষ্টি কমলিকা লাভ করে বিরহের মাধ্যমে, মিলনের উৎসবে নয় অবশ্যই ।

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবানুগামী । দেহের ত্রুটিকে প্রেমের দাবীর দুর্বলতা বলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন । প্রেম যে কুরূপকে সুরূপ বলে অনুভব করে তা বাস্তবাতীত আদৌ অন্যকিছু নয় । জীবনে মাতৃস্নেহ যেমন বিরল নয়, তেমনি পত্নীপ্রেমেও অবাস্তব নয়, অন্তরের রসই যে প্রেমের প্রাণ– তা বাস্তব, তা সত্য । বাস্তবতার নামে কেবল দেহগত প্রেমের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা অতিরঞ্জন-অতিশয়োক্তির মতই অসত্য । বাস্তব জীবনে দেহ অবলম্বন যেমন সত্য তেমনি অন্তররসে প্রেমের স্থায়িত্ব ও মাধুর্যতাও অস্বীকার করা যায় না । রবীন্দ্রনাথ বাস্তবানুগামী ছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না, তবে তিনি আজীবনই উপলব্ধি করেছিলেন বিরহের । এর প্রভাব তাঁর অনুভব থেকে যাওয়ার কথা নয় । বাস্তব-অবাস্তব বিচার করতে না-বসে বলা যায় যে, বিরহের রবীন্দ্রনাথ এখানেও প্রেমকে বিরহের মধ্য দিয়ে করুণ না-করে সার্থক হতে দেননি । অবশেষে দুঃখ-বিহর-কষ্ট-যন্ত্রণার পথ বেয়ে রাজার সঙ্গে কমলিকার মিলন ঘটে । কমলিকা বিরহের দুঃখ ও আত্মগ্লানির আগুনে শুদ্ধ হয়ে বুঝতে পারে কুশ্রীর মাঝেই বাস করে নয়ন-ভুলানো আলো । নিমফুলের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অন্ধকার ঘরে নিয়ে আসে অর্নিবচনের আমন্ত্রণ । বীণায় বাজতে থাকে 'গরজের বিত্তবল মীর' । কাতর হতাশ কমলিকার আগমণ ঘটে রাজপ্রসাদে । রাজার সামনে । কমলিকার আগমনে বীণা থেমে যায় । কমলিকা ও রাজার এই মিলন বহু প্রত্যাশিত ও নবমূল্যবোধে উজ্জীবিত; তাই একদিকে যেমন রাজা আহ্বান করে কমলিকাকে 'ভয় করো না, প্রিয়ে, ভয় করো না' বলে, অন্যদিকে কমলিকা 'জয় হোলো তোমারই' বলে ছুটে আসে রাজার কাছে ।

রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এই নাট্যে । কুরূপের প্রতি বিমুখ বধূর বিরহে নব প্রেমদৃষ্টি লাভ । বধূর বিরহের অন্তরে প্রেমদৃষ্টি উন্মীলনে সাহায্য করে অরুণেশ্বরের বীণা ও নৃত্য-সঙ্গীত । তার অন্ত রের ঐশ্বর্য, তার অন্তরের প্রতিশ্রুতি । প্রেমের উন্মীলনে অন্তরের সম্পদ যে গোপনে গভীর অশ্রুর প্রেরণা যোগায়, দেহের আধারে সেই উন্মেষ যে সম্ভব না, তারই উপলব্ধি এখানে প্রত্যক্ষ করা যায় । রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি বাস্ত বজীবনে অনাবৃত না-থাকলেও বাস্তবাতীত নয় । বিস্ময়বোধ হয়, প্রভূত সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েও কুরূপের বাস্তব বেদনাটি কেমন করে রবীন্দ্রনাথ এত সুস্পষ্টভাবে স্পর্শ করেছিলেন । এ কী শুধুই সম্ভব হয়েছে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তির বলে! 'শাপমোচন'-এ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন সম্ভবপর করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । এখানে এ-ই প্রমাণিত হয় যে, যে-সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে মোহগ্রস্ত ও অহংকারী করে তুলে, অসত্য ও অশুভবোধ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই 'শাপমোচন' নাট্যটি লিখেছিলেন ।

সংযোজন: ৩রা জানুয়ারী ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে 'শাপমোচন' কলকাতায় প্রথম অভিনীত হয় । তখন 'শাপমোচন'কে সাজানো হয় ১৯টি গান দিয়ে—'পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়', 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়', 'তুমি কি কেবলি ছবি', 'তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে', 'বাজোরে বাঁশরী বাজো', 'লহো লহো তুলে লহো', 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়', 'কোথা বাইরে দূরে যায়রে', 'আনমনা, আনমনা', 'আমি এলেম তারি দ্বারে', 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে', 'বসন্তে ফুল গাঁথল', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন', 'পাখী আমার নীড়ের পাখী', 'না যেয়ো নাকো', 'সখি আঁধারে একলা ঘরে', 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে' ও 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' ।[২৭]

৬ই ও ৭ই মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে 'শাপমোচন' অভিনীত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য নৃত্যনাট্যের মত 'শাপমোচন' নাট্যকেও ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেন, তখন সাজানো হয় ২৪টি গান দিয়ে—'নৃত্যের তালে তালে', 'পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়', 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়', 'পরবাসী চলে এস ঘরে', 'তুমি কি কেবলি ছবি', 'দে পড়ে দে আমায় তোরা', 'তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে', 'বাজোরে বাঁশরী বাজো', 'লহো লহো তুলে লহো', 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে', 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়', 'কোথা বাইরে দূরে যায়রে', 'আনমনা, আনমনা', 'আমি এলেম তারি দ্বারে', 'বসন্তে ফুল গাঁথল', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন', 'পাখী আমার নীড়ের

[২৭] গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী ।

পাখী', 'অসুন্দরের পরম বেদনায়', 'না যেয়ো না যেয়ো নাকো', 'সখি আঁধারে একলা ঘরে', 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে', 'একি আকুলতা ভুবনে' ও 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'। এতে অভিনয় করেছিলেন—বাসুদেব (ইন্দ্র), অমলা (ইন্দ্রাণী), সন্তোষ ভঞ্জ (সৌরসেন), ললিতা (মধুশ্রী), যমুনা (কমলিকা) ও শান্তিদেব (অরুণেশ্বর)। তাছাড়াও ইন্দ্রসভার গান ও বাজনার দলে ছিলেন—রণজিৎ সিংহ, বনবিহারী, সাগরময়, তারাকুমার, শৈলজারঞ্জন, অমিয়া দেবী ও অমলা দেবী। সখীদের দলে ছিলেন—নন্দিতা, নিবেদিতা, ললিতা, সুকৃতি, মমতা, সুনীপা ও নন্দিনী; পত্রবাহিকারা ছিলেন—অমলা ও হৈমন্তী; রাজ অনুচররা—হৈমন্তী ও শরদিন্দু।

১৩ই মার্চ উত্তরায়ণে ও ২৮-২৯শে মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টব্দে কলকাতার 'নিউ এ্যাম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে 'শাপমোচন' অভিনীত হয়, তখন গদ্যাংশটি আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। ২৯শে মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে 'শাপমোচন' অভিনীত হওয়ার সময় যে গানগুলো পরিবেশিত হয় সেগুলো হচ্ছে—'পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়', 'ভরা থাক স্মৃতি সুধায়', 'জাগরণে যায় বিভাবরী', 'এসো হে তৃষ্ণার জল', 'ও আমার চাঁদের আলো', 'তুমি কি কেবলি ছবি', 'কখন দিলে পরায়ে', 'দে পড়ে দে আমায় তোরা', 'বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে', 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে', 'তোমার আনন্দ ঐ এল এল দ্বারে', 'বাজোরে বাঁশরী বাজো', 'লহো লহো তুলে লহো', 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাবার আগে', 'এসো আমার ঘরে এসো', 'কোথা বাইরে দূরে যায়রে', 'আমি এলেম তারি দ্বারে', 'আনমনা, আনমনা', 'হায়রে ওরে যায় না কি', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে', 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন', 'না যেয়ো না যেয়ো নাকো', 'সখি আঁধারে একলা ঘরে', 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে', 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে', 'ও কি এলো', 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' ও 'ওরে পথিক ওরে প্রেমিক'।[২৮]

'শাপমোচন' ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে বোম্বেতে, সেপ্টেম্বরে কলকাতায়, নভেম্বরে শান্তিনিকেতনে ও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলম্বোতে, অক্টোবরে মাদ্রাজ ও ওয়ালটেয়ারে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শেষবারের মত 'শাপমোচন' অভিনীত হয় সিংহসদনে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের 'শাপমোচন' অভিনয়ের সময় অন্তর্ভূক্ত গানগুলো হচ্ছে—'নহ মাতা, নহ কন্যা'; 'হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র'; 'ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়'; 'তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে'; 'ওরে চিত্ররেখাডোরে'; 'তুমি কি কেবল ছবি'; 'কখন দিলে পরায়ে'; 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়'; 'তোমায় সাজাব যতনে'; 'দে পড়ে দে আমায় তোরা'; 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে'; 'বঁধু, কোন্ মায়া লাগল চোখে'; 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে'; 'বাজো রে বাঁশরি, বাজো'; 'লহো লহো তুলে লহো'; 'হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে'; 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে'; 'কাছে থেকে দূর রচিল'; 'আনমনা আনমনা'; 'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা'; 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার'; 'অসুন্দরের পরম বেদনায়'; 'একদিন সইতে পারবে, সইতে পারবে'; 'তোমার এ কী অনুকম্পা অসুন্দরের তরে'; 'না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো'; 'সখী, আঁধারে একেলা ঘরে'; 'কোন্ গহন অরণ্যে তারে'; 'ও কি এল, ও কি এল না'; 'মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি'।[২৯]

মাদ্রাজে 'শাপমোচন' অভিনয়-প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবীকে লেখা একপত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হবে। জিনিসটা [শাপমোচন] এবার সবসুদ্ধ অন্যবারের চেয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণতর হয়েছে।'[৩০] 'শাপমোচন'কে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে দিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন,

> I am requested to give our audience some idea of the story upon which the musical play to be performed tonight is based. Let me confess that the story is immaterial, it can be ignored with impunity. I as my audience not to distract their attention by seeking meaning which belongs to the alien kingdom of language; but keep their minds passive in order to be able to receive an immediate impression of the whole, to capture the spirit of art which reveals

[২৮] গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য।
[২৯] গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৩০] ৩১ অক্টোবর ১৯৩৪, চিঠিপত্র, রবীন্দ্র-রচনাবলী।

itself in the rhythm of movements, in the lyric of colour, form and sound, and refused to be defend or described by words.[31]

প্রথম 'শাপমোচন' অভিনয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার তার রদবদল করেছিলেন। এমনকি 'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবক ও চতুর্থ স্তবকের প্রথম চার পংক্তির পর তৃতীয় স্তবকের শেষ পাঁচ পংক্তি নিয়ে সুর বসিয়ে এ নৃত্যনাট্যে সংযুক্ত করেছিলেন। গবেষকদের মতে, ছন্দসৃষ্টিতে সুরের সহায়তার মত বাণীর সহায়তাও মূল্যায়ন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গানে। যুক্তব্যঞ্জন বহুল পদ রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রধান গানগুলোতে পরিস্ফুটিত। কয়েকটি গানে বদ্ধধ্বনির সঙ্ঘাতে ছন্দের নবজগৎ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন, 'বাজোরে বাশঁরী বাজো' গানের একটি পঙক্তি 'সুন্দরী, চন্দনমাল্য মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো' থেকেই বোঝা যায় যে, সুরের ধারা কী করে আপন ধ্বনিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে বদ্ধতাকে উত্তীর্ণ করেছে। 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' গানটি সম্বন্ধে শৈলজারঞ্জন মজুমদার বলেছেন, 'গানটির স্বরলিপি আট মাত্রায় লিপিবদ্ধ, কিন্তু গাওয়ার সময় চার মাত্রার তালে গাওয়া হয় শান্তিনিকেতনে।'[৩২] আর 'নৃত্যের তালে তালে' গানটি সম্বন্ধে শৈলজারঞ্জন মজুমদার বলেছেন, 'গানটির আরম্ভের ছন্দ গাম্ভীর্যপূর্ণ। সেখানে ছয়মাত্রার তাল উপযুক্ত। কিন্তু একই গানে ভাব-অনুযায়ী ছন্দের গতির তারতম্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই 'হে' তানে যে-চঞ্চলতা জাগে তা আবার তিনের ছন্দেই যোগ্যভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের ছন্দকে গুরুত্ব দিতেন ব'লেই একই গানে দুই মাপের পর্ব বিন্যাসে কুণ্ঠা বোধ করেননি।'[৩৩]

[31] Rabindranath Tagore, May 12, 1934.
[৩২] রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ।
[৩৩] রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ।

চণ্ডলিকা

Chandalika, 1966.
Shanti Bose, Jharna Dutta & Pranati Sengupta.

'চণ্ডালিকা' ভাদ্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, আর ফাল্গুন ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' গ্রন্থাকারে এবং চৈত্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে স্বরলিপিসহ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে রবীন্দ্র রচনাবলীতে এ মুদ্রিত হয়েছে, তবে এর প্রভেদ সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে লেখা হয়েছে, 'প্রথম সংস্করণের সহিত স্বরলিপি-সংস্করণের প্রধান প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত সংস্করণে প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে ফুলওয়ালির দলের "নব বসন্তে র গানের ডালি" গানটি নূতন সংযোজন, এবং নীচের দুইটি গান সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।/ আয় রে মোরা ফসল কাটি।/ মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে/ ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।/ [...] এই গানটি প্রথম দৃশ্যে "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" গানের [...] অব্যবহিত পূর্বে 'পুরুষ' দলের গান রূপে ছিল।/ হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরুগুরু ইত্যাদি।/ দ্বিতীয় দৃশ্যের সর্বশেষে ইহা 'পুরুষদলের নৃত্য' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।'[৩৪]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত 'দি সাংস্কৃত বোদ্ধিস্ট লিটারেচার অফ নেপাল' গ্রন্থের 'শার্দূলকর্ণাবদান'[৩৫]-এর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয় এ-থেকেই এই নাটকের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মূলকাহিনীটিকে একটু পরিবর্তন করে 'চণ্ডালিকা'য় ব্যবহার করেছিলেন। 'চণ্ডালিকা'র আখ্যান প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' বলে যে, মূল আখ্যানের সঙ্গে এ নৃত্যনাট্যের আখ্যানাংশে কিছু তফাত আছে।[৩৬] 'চণ্ডালিকা' গল্পের ঘটনাস্থল 'শ্রাবস্তী'[৩৭]; এতে চণ্ডাল

[34] গ্রন্থপরিচয়।

[35] 'Matters, however, did not progress so satisfactory as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ananda daily went to the city for alms. Ananda came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and Ananda, followed by the girl, ran back to the hermittage, and reported the occurence to the Loard. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of disciple. He said to Prakiti, "You want to marry Ananda. Have you got the permission of your parents? Go, and get ther permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon returned from the city with her parents' permission. The Lord the said, "Should you wish to marry Ananda, you must put on the same kind of ochre-coloured vestment which he uses." She agreed, and thereupon her head was shaved, she was made to put on ochre-coloured cloth, diversted of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called sarva durgati-sodhana-dharani, the destroyer of all evils. Thus did the Lord convert her into a Bhikshuni.' - The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882.

[৩৬] 'চণ্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটা মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে আপনাকে

সমাজের দুই নারীকে নিয়ে মূল কথোপকথন সৃষ্টি করে ১৩টি গান দিয়ে সাজানো হয়। ১৮-২০শে মার্চ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম; তারপর ৯-১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

মানবকল্যাণে নিয়োজিত ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত যে-কোনো চিন্তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। যা-কিছু মানবকল্যাণ বিরোধী তার প্রতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বীতশ্রদ্ধ। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকে লাঞ্ছিত করে যেখানে মানুষ সংকীর্ণ চিন্তার দ্বারা চালিত হয়েছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদী। আর এ-প্রতিবাদ প্রকাশ করতেই রচনা করেছেন 'চণ্ডালিকা'; অস্পৃশ্য, অনাদৃত, অবহেলিত মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মানে উন্নীত করতে। এ মানুষের জীবনে প্রতিদিন নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। সংসারের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয়। চলতে হয় সকালবেলার হাটে, দোকানের মেলায়, গ্রামের লোকজনের হাসিখেলায়। ফুলওয়ালির যত্নভরা মাধবী-মালতী-অশোকমঞ্জরীর মালার সমাবেসে। এ মালা বিক্রি করার জন্য ফুলওয়ালিরা জানায় গ্রামবাসীকে যৌবনের আমন্ত্রণ, আহ্বান। এ-আহ্বানে আর কেউ সাড়া না-দিলেও চণ্ডালকন্যা 'প্রকৃতি' কিন্তু ঠিকই দেয়; চঞ্চলিত চরণে, প্রফুল্ল মনে। কিন্তু ফুলওয়ালিরা তাকে ঘৃণাভরা অন্তরে তাকে সরিয়ে দেয়। প্রকৃতি এ-অপমানকে মনে না-মেখে যখন শুনতে পায় এক দইওয়ালা ডাক, 'দই চাই গো, দই চাই গো, দই চাই গো?/ শ্যামলী আমার গাই/ তুলনা তাহার নাই'[৩৮]; তখন তার কাছে ছুটে যায়। ছুটে যায় যে গাই ভোরবেলা কঙ্কণানদীর ধারে, দুর্বাদলঘন মাঠের ঘাস খেয়ে দুধ দিয়েছে তার দই খেতে। প্রকৃতি দইওয়ালার আহ্বানে হাত পাতে একদল মেয়ে দইওয়ালাকে সাবধান করে দেয়, 'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ছি,/ ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।'[৩৯] দইওয়ালা জানে চণ্ডালজাতি সকলের অস্পৃশ্য– সমাজের নিচুস্তরে তাদের আবাস। সমাজের কোনো কাজে মনুষ্যোচিত অধিকার তাদের নেই। এদের ছোঁয়া দই কেউ খাবে না, তাই দই নষ্ট হওয়ার ভয়ে সে তার দইয়ের পাতিল নিয়ে ছুটে পালায়। তারপর চুড়িওয়ালার আহ্বানে সাড়া দিতেই একদল মেয়ে সর্তক করে দেয় তাকে, 'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ছি,/ ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।'[৪০] চুড়িওয়ালা একথা শুনে তটস্থ হয়ে সরে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে মোহগ্রস্তভাবে নয়, নিরপেক্ষ রসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন; ভেবেছেন অবহেলিত মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা। এ-চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, জীবন সকল ক্ষেত্রে অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণের বেড়া জালে আবদ্ধ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-খণ্ড-সংকীর্ণ ভাব অবহেলিত মানুষকে করে লাঞ্ছিত। এ-অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে 'প্রকৃতি'র মাধ্যমে। প্রকৃতির মনে প্রথমবারের মত সৃষ্টি হয় প্রতিবাদ। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধিক্কা। দ্রোহ। তাই ত বলে, কেন পাঠালে আমাকে অপমানের এ-অন্ধকারে?[৪১] 'চণ্ডালিকা'র এ-গানে তাল ও লয়ের বিচিত্র প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে 'প্রকৃতি'র জন্মের বিড়ম্বনা আর সেই সঙ্গে জীবনের বিড়ম্বনাকে অস্বীকার করার দ্রোহ প্রকাশ করেছেন। এ-গান রবীন্দ্রনাথের একটা আশ্চর্য সৃষ্টি। এর ছন্দবদল ও লয়ের পরিবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতির সমস্ত জীবনের বিসন্নতা এক নিমেষে উদ্ভাসিত হয়েছে। এ গানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সকলের সামনে প্রশ্ন তুলেন,– কেন 'পূজিব'? কেন ফুল দেব? সৃষ্টিকর্তাই তো আমার জীবনকে চিরদিনের জন্য রেখে দিলেন ধিক্কারে।[৪২]

বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ বিষাদ করুণার আতিশয্যে।..../ মূল আখ্যানের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যান-অংশ কিছু তফাত হয়ে গেছে। নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলাবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিককে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও সাহিত্যের দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক পরিচালনায় কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি।/ প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তার পর অসীম ছন্দের মধ্যে দিয়ে টানা-ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে। মূল উপাখ্যানের মধ্যে যদিও আনন্দে স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তার দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে। আনন্দের যে দ্বন্দ্ব যে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। এক দিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, এক দিকে তার দেহের কামনা; এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি, দিশাহারা উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল না সে সংসারের মায়াজালে। চিরবৈরাগী পুরুষ, যার প্রেরণায় সে ছুটেছে উত্তর মেরুতে, উড়েছে আকাশ পথে, ডুবেছে অতল সমুদ্রে, সেই দুর্দাম শক্তির পুরুষকার দেহের আকর্ষণ থেকে আনন্দকে পৌঁছে দিল পৌরুষের অসাধারণ গৌরবে। ..../ এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর করে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।' – প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৫৪।

[৩৭] চণ্ডালিকা, ১৩৪০।
[৩৮] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।
[৩৯] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।
[৪০] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।
[৪১] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।
[৪২] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।

এ গানের মাধ্যমে সমাজের শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন দ্রোহ। মানবতার সপক্ষে উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহী বাণী; সত্য ও মঙ্গলের আকাঙ্খায় তিনি যাবতীয় অপশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। করেছেন সমাজের শোষণের এবং জীর্ণ সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।

প্রকৃতি যখন দ্রোহ প্রকাশ করছে তখন দূরপথে বৌদ্ধভিক্ষুগণ শান্তিবাণী জপতে জপতে চলেন। প্রকৃতি যখন কুয়ো থেকে জল তুলতে শুরু করে তখন এক শ্রান্ত তাপিত-পিপাসিত বুদ্ধশিষ্য আনন্দ, প্রখরতর রৌদ্রে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কুয়োতলে এসে উপস্থিত হন। তিনি জল চান। নূতন মনুষ্যত্বচেতনার উদ্বোধকের কাছে নিজেকে সর্ম্পণ করে জল দান করে 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি সংকোচ প্রকাশ করে। কারণ, সে চণ্ডালের কন্যা, তার অধিকার নেই পুণ্যব্যক্তিকে জল দেবার। তাই বলে, 'ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো মোরে।' এক অস্পৃশ্যা, অনাদৃতা নারী 'প্রকৃতি'কে দেখে আনন্দের মনে সহানুভূতি জেগে উঠে। চণ্ডাল পরিচয়ে নিরস্ত না-হয়ে আনন্দ তাকে বোঝাতে চান যে, সে যে-মানবের সন্তান বুদ্ধশিষ্যও সে একই মানবের সন্তান। তাই তাকে জল দিলে প্রকৃতির কোনো অমঙ্গল ঘটবে না। আনন্দের কথাগুলো শুনে প্রকৃতির অন্তঃকরণে এক 'সৃষ্টি সুখের উল্লাস' আবির্ভূত হয়। সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ অনুভব করে। লাঞ্ছিত-স্বার্থপরতার সুকঠিন জাল যেন অনায়াসে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে পড়ে। অস্থির সংসার মাঝে প্রকৃতি এক চিত্তমুক্তির নিদর্শন-আদর্শ খুঁজে পায় যেন। আনন্দকে সর্বস্ব তৃপ্তিতে সমর্পণ করে জলদান করে প্রকৃতি। আনন্দ আশির্বাদ করেন। তিনি জল পান করে চলে যান।

এ অভূতপূর্ব ঘটনা 'প্রকৃতি'র জীবনে বয়ে আনে এক যুগান্তর। শুরু হয় প্রকৃতির জীবন জুড়ে নাচ। নবজাগ্রত মানব-অধিকার বোধে সদ্য-সচেতন প্রকৃতি বুঝতে পারে– সে ঘৃণ্য নয়– জগতের সকলের সেবার অধিকার তারও আছে। তাই এ বোধ–জাগ্রতকারী বৌদ্ধভিক্ষুকের পায়ে আত্মসমর্পণ করে তাঁর শিষ্যত্ব-গ্রহণে তাঁর সেবার অধিকার-লাভ এবং সে-সঙ্গে সকলজাতির সেবার অধিকার লাভই প্রকৃতির আন্তরিক কামনা। এ কারণে সে আনন্দকে লাভ করতে চায়– কারণ এরকম মর্যাদা তাকে এর আগে কেউ দেয়নি, আনন্দই সর্বপ্রথম তাকে এ সম্মান দেন! টলোমলো করে উঠে তার প্রাণ। এ যেন মুক্তির আহ্বান। এ প্রথম সে বুঝতে পারে কে যেন তার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়েমুছে দিয়ে গেছেন। এ অনুভূতিই প্রকৃতির প্রকৃত আনন্দ। যথার্থ আত্মপরিচয়। সে জানতে পায় দুঃখ-লাঞ্ছিনার ঊর্ধ্বে সমস্ত গৌরবের মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দ বিরাজ করে। এ আনন্দই হচ্ছে সমাজিক সংস্কার, ঘৃণার ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। তাই যখন ফসল কাটার আহ্বান আসে তখন প্রকৃতি সাড়া দেয় না। সে বলে, 'ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না।' কারণ, কাজভোলা তার মন ব্যস্ত এক দূর-স্বপ্নের সাধনায়।

প্রকৃতির চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দোলাচল নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। গবেষকরা বলেছেন যে, এমনকি তালের বিবিধ প্রয়োগ ও লয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমেও। যেমন, প্রকৃতি যখন তার মায়ের কাছে আনন্দের আবির্ভাবের বর্ণনা করে দাদ্‌রা তালে নিবদ্ধ দ্রুতলয়ে 'এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার' তখন এ বলার উচ্ছ্বাস, ভাবাবেশ তার সমস্ত অস্তিত্বের কুল ছাপিয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে যখন 'সেদিন বাজল দুপুরের ঘন্টা/ ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর' বলে উঠে তখন সে ফিরে যায় তার রূঢ়বাস্তব আপন জীবন-প্রকৃতির মধ্যে। এখানে তার উচ্ছ্বাস ফল্গুধারার মত প্রচ্ছন্ন।

প্রকৃতি চায় আনন্দকে। চায় তার সেবিকা হতে। কারণ আনন্দ তাকে ধুলো থেকে তুলে নিয়ে স্থান দিয়েছেন বুকে। আনন্দের সাহচর্য কামনা তাকে মধুর অনুভূতিতে আবিষ্ট করে রেখেছে। তাই বলে, 'আমি চাই তাঁরে/ আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান/ ঝড়ে-পড়া ধুৎরো ফুল/ ধুলো হতে তুলে নিলেন তিনি দক্ষিণ করে।'[৪৩] কিন্তু মা তাকে সাবধান করে দেয়, 'অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক্ সাবধানে।'[৪৪] কিন্তু আনন্দের প্রতি আসক্তির কথা থেবে তার মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাই মাকে অনুরোধ করে মন্ত্র পড়ে আনন্দকে বাড়িতে আনতে। মেয়ের কথায় মা আঁতকে উঠে। তার বুক কাঁপে। বলে, 'ওরে সর্বনাশী, কি কথা তুই বলিস/ আগুন নিয়ে খেলা।'[৪৫] কিন্তু প্রকৃতি ভয় করে না। সে আনন্দকে নিতান্ত

[৪৩] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।
[৪৪] চণ্ডালিকা (নাটক), রবীন্দ্র রচনাবলী।
[৪৫] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।

ই চায়। এ জন্মের পূজার ডালি সাজিয়ে আনন্দের সামনে রাখতে চায়। গৌবর করে বলতে চায় সে আনন্দের সেবিকা। সে চিরদিনের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে মুক্ত নারীর মত আত্মপ্রকাশ করতে চায়। মা প্রকৃতিকে বোঝাতে চেষ্টা করে। বোঝাতে চায় মিছে রাগ না-করার জন্যে। বিধাতার লিখন কে-ই-বা খণ্ডাতে পারে? কিন্তু প্রকৃতি তার মায়ের কথা মানতে নারাজ। বরং মাকে বলে মিথ্যে নিন্দা না রটানোর জন্যে। সে চণ্ডাল তা জানে; কিন্তু আজীবন সে নাম নিয়ে বন্দি থাকতে চায় না। আঁধার কোঠায় থাকতে আর চায় না। জন্মকে সার্থক করতে চায়। তাই মাকে আবার অনুরোধ করে। মা বলে যে, যদি সে আনতে পারে অনন্দকে তবে কি মেয়ে তার মূল্য দিতে পারবে। প্রকৃতি সম্মতি জানায়।

মন্ত্র শুরু হয়। একি সঙ্গে মায়ানৃত্য শুরু হয়। মায়ের দেওয়া মায়াদর্পণকে প্রকৃতি হাতে নিয়ে নাচতে শুরু করে। এতে দেখতে পায় আনন্দের মধ্যে ব্রহ্মচর্য ও যৌন-আকাঙ্ক্ষার যে কি যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধ নিবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির। একদিকে পশ্চিমে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ঘিরে যাচ্ছে পথ, দূরে সমুদ্র ফেনিয়ে উঠছে, আনন্দ দু'বাহু আকাশে তুলে অভিশাপ দিচ্ছেন। সংযম ও ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ম্লান, ব্যথিত আনন্দের মূর্তি দেখে প্রকৃতির মনে সন্দেহ জাগে, বুক ফেটে যায়, দূরদূর করে উঠে অন্তর। নিজের নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত। এর ফলে প্রকৃতির মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা পথও বেরিয়ে আসে। প্রকৃতি মায়াদর্পণ নিয়ে অগ্নিশিখার মত নাচতে থাকে। শুদ্ধচরিত্র অপাপবিদ্ধ আনন্দ প্রকৃতির মায়ের মন্ত্রের মোহে কামার্ত হয়ে তাদের দ্বার অভিসারে আসতে থাকেন। চারিদিকে বিদ্যুৎ চমক। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে অগ্নি। মায়ের মন্ত্রবাণী কালিনাগিনীমূর্তির রূপ ধারণ করে। গর্জে উঠে বিষ নিশ্বাস। অগ্নিসাগিনী তাকে ছোবল মারে, চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব। অসীম দুঃখের মূর্তি যেন আনন্দ। কলুষিত করে তার পুণ্যদেহ। এ অংশ সম্বন্ধে গবেষকরা বলেছেন যে, এ যে চিত্রকল্প, এ যে নাটকীয়তা—এ কেবলমাত্র সুরের বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়নি, এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তালের বিভিন্নতা এবং লয়ের হেরফের। স্মৃতিচারণ এবং পরমুহূর্তে সে-স্মৃতিবাহী মনে আত্মোপলব্ধির আশ্চর্য অভিজ্ঞতা তাল এবং লয়ের পরিবর্তনে এক রোমাঞ্চকর নাট্যমুহূর্তের জন্ম দেয়—নাটকের ভাবচূড়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

এক আন্তরিক অথচ নির্মম সত্যকে উদ্ঘাটিত করেন রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের মাঝে। আর তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন লয়ে কাহারবা তালের বাঁধেন 'ওরে পাষাণী, কি নিষ্ঠুর মন তোর,/ কী কঠিন প্রাণ—/ এখনো তো আছিস বেঁচে' ও 'ক্ষুধার্ত প্রেম, তার নাই দয়া,/ তার নাই ভয়, নাই লজ্জা'[৪৬] সংলাপটাকে! এ-কথাগুলো ঝাঁপতাল, তেওড়া, চৌতাল অথবা দাদরা তালে প্রকাশ করলে এর মর্মান্তিক বেদনা উপলব্ধি করা যায় না। সহজ কাঠামোর মাধ্যমে এমন এক গভীর অনুভূতি প্রকাশের পন্থা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মত সঙ্গীতস্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

সাংসারিক জীবনের মধুর আকর্ষণ প্রকৃতিকে বিভ্রান্ত করে তুলে। দ্বিধান্বিত চিত্তে আনন্দকে সে যতোই কাছে টেনে নিতে চায় কিন্তু মায়াদর্পণে আনন্দের পতনের দৃশ্য দেখে সে আর্তনাদ করে ওঠে,

ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র—/
এখনি, এখনি, এখনি।/ ও রাক্ষুসী, কী করলি তুই,/ কী করলি তুই
মরলি নে কেন পাপীয়সী।/ কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল/ শুভ্র সুনির্মল
সুদূও স্বর্গেও আলো।/ আহা, কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর!/ যাক যাক যাক,/ সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের,/ জয় হোক তাঁর—/ জয় হোক তাঁর, জয় হোক।[৪৭]

আনন্দ প্রকৃতির সামনে এসে উপস্থিত হন। প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত সত্যানুসন্ধান করতে সক্ষম হয়। তার আত্মবোধের উদ্বোধন ঘটে। তাই সে নির্দ্বিধায় বলে, 'প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এত দুঃখই পেলে—ক্ষমা

[৪৬] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।
[47] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা।

করো, ক্ষমা করো।'[৪৮] তপস্যার অহংকার উপেক্ষা করে আনন্দ প্রকৃতির টানে বাস্তবে যেন ফিরে এলেন। সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনে যেন তিনি বাস্তব-জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেলেন। প্রকৃত প্রেমের বন্ধনে যখন দুটো প্রাণের মিলন ঘটে তখনই 'সীমায় অসীমে মিলিত'[৪৯] হয় 'সীমার মিথ্যা-তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা-শূন্যতা'[৫০] দূর হয়ে যায়। তাই আনন্দ বলেন, 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।'[৫১] রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ-ভাবনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে যে-সাধনা, তা সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাই ত এ নাটকের মাধ্যমে সমাজ-বিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। কারণ, 'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।'[৫২] সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমনি প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন তেমনি 'চণ্ডালিকা'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—জয় হয় পুণ্যের, জয় হয় সংযমের, জয় হয় করুণার, জয় হয় ক্ষমার, জয় হয় প্রীতির ও সাম্যবোধের।

সংযোজন: ১৮-২০শে মার্চ ১৯৩৮ সালে কলকাতার 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটা অভিনীত হয়। তারপর ৭ই জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতন আর ৯-১০ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার 'শ্রী রঙ্গমঞ্চ'-এ অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করেন—নন্দিতা (প্রকৃতি), মৃণালিনী (মা), কেলু নায়ার (বৌদ্ধভিক্ষু), অনঙ্গলাল (দইওয়ালা), মাকী (চুড়ীওয়ালা)। আর সখীরা ছিলেন—সুকৃতি, অনু, মমতা, সুজাতা ও উর্ম্মী। মহাত্মা গান্ধীকে দেখানোর জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে আবার 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মহাত্মাজিকে চণ্ডালিকা দেখানো হোলো, খুশি হয়েছেন।'[৫৩]

প্রতিমা দেবীর পরিকল্পিত 'চণ্ডালিকা' প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, 'প্রতিমা দেবীর লিখিত নৃত্যপরিকল্পনাটি ছিল এই রূপ:/ প্রথম দৃশ্য।/ নৃত্য—অভিনয়।/ সকালবেলায় গ্রামের ধারে হাট বসেছে। ছেলেমেয়েরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াইতেছে, কোথাও মেয়েরা দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া চুড়ি পরিতেছে, কোথাও পানের দোকানে পান খাচ্ছে। ছেলেরা একদিকে হাডুডু খেলিতেছে। কুয়োর ধারে গান ও উৎসব চলছে। এমন সময় সাঁওতাল সর্দারের নৃত্যের সহিত প্রবেশ, তাঁর নৃত্য শেষ হলে যেখানে সাঁওতাল মেয়েরা নাচিতেছিল, সেইখানে গিয়ে প্রকৃতিকে তাঁর নৃত্য সহচরী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। চণ্ডালিকা এই অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ একটা ময়ূরপুচ্ছ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নাচ আরম্ভ হল, এই দুই যুগল নৃত্যকারীকে মধ্যে রাখিয়া সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীত শুরু করিল।/ গান—।/ এমন সময় চণ্ডালিকার মা জল লইতে কুয়োতলায় উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন। এবং নৃত্য বন্ধ করিয়া ভঙ্গী, কেহ বা বসিয়া পড়িবেন, কেহ বা থমকিয়া দাঁড়াইবেন। মা প্রকৃতিকে নৃত্যরতা দেখিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া কুয়োতে জল তুলিতে লাগিলেন। জল তুলিয়া যাইবার সময় মেয়েকে জানাইয়া গেলেন, আর না নাচিয়া জল তুলিয়া ঘরে চলিয়া আসিবার জন্য। চারিদিকে অন্যান্য লোকেরা বুড়ীর রাগ দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। মা ঘরে চলিয়া যাইবার পর সর্দার আবার প্রকৃতিকে নাচিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সর্দার হতাশ ভাবে তাহার শেষ নৃত্য করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।/ গান—।/ তাহার পর প্রকৃতির জল তোলা নাচ শুরু হল। তখন হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লোকেরা সব বাড়ি ফিরিয়াছে। মাঠের রাস্তা শূন্য, প্রকৃতি গাইছেন—'আমার মলিকা বনে'। এমন সময় দূরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন্ত্রধ্বনি শোনা গেল। অনেকগুলি ভিক্ষুক মাঠের রাস্তা বেয়ে চলে গেল। শেষেরটি কেবল কুয়োতলায় এসে জল ভিক্ষে করে দাঁড়ালেন। (চণ্ডালিনীর জলদান এবং ভিক্ষুর জল গ্রহণ সমস্তই রিথ্‌মিক্যাল মূক অভিনয় করিতে হইবে)। ভিক্ষু যখন কুয়োতলায় এসে দাঁড়াবেন তখন চণ্ডালিকা

[৪৮] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।
[৪৯] জীবনস্মৃতি।
[৫০] জীবনস্মৃতি।
[৫১] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।
[৫২] জীবনস্মৃতি।
[৫৩] **রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সাল।**

বলবেন—'আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ' । ভিক্ষু বলবেন—'যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, সব জলই তীর্থ জল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে' । এই কথা বলিয়া ভিক্ষু জল খাইয়া চলিয়া যাইবেন । চণ্ডালিকার নাচ ও গান—'বলে দাও জল, দাও জল, দেব আমি/ কে দিয়েছে হেন সম্বল' । এই নাচের পর চণ্ডালিকা ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইয়া দূরে ভিক্ষুদের মন্ত্রধ্বনি কান পাতিয়া শুনিবেন । তারপর তিনি বলিয়া উঠিবেন—'কেবল একটু গণ্ডূষ জল নিলেন তিনি আমার হাত হইতে, অগাধ অসীম হইল সেই জল, সাত সমুদ্র এক হইয়া গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কূল, ধূয়ে গেল আমার জন্ম । এখনও গভীর কণ্ঠে শুনিতেছি যেন বলছেন—'জল দাও, জল দাও' ।/ শেষ গান—'দীপ নিভে গেছে মম,/ এসে তুমি যেও না কো ফিরে' ।'[৫৪]

প্রতিমা দেবীর লিখিত পরিকল্পনাটা পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাটকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার বাসনায় নূতন গান রচনা করেন । এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বৌমা আগামী অভিযানের জন্য চণ্ডালিকা তৈরী করাতে চান । [...] বৌমা চণ্ডালিকার উপসর্গ আমার ঘাড়ে একদা চাপিয়েছেন, সকাল থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মাথা চল্‌চে চরকার মত । সমস্ত চণ্ডালিকার গদ্য অংশকেও গানে রূপান্তরিত করতে হবে । [...] কবে খালাস পাব ঠিক বলতে পারচি নে ।'[৫৫]

তিনি অন্যত্রে লিখেছেন, 'কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি ।'[৫৬] *আরো লিখেছেন, 'আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌঁড় । সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না । কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি । খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয় । প্রথমত বিদেশী হাটে চালান করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয় দেশের মাতব্বর লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন ব'লে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুরুব্বিয়ানা মিশিয়ে করবেন । অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন, যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয় । অর্থাৎ আছি আমি অজন্তা-গুহায়—তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতুবি বিভাগে রয়ে গেছে ।'*[৫৭]

[54] গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য ।

[55] ১১ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালের এক পত্র ।

[56] ৭ই মার্চ ১৯৩৮ সালের আরেকটি পত্র ।

[57] ২১-১-১৩৩৮ সালের একটা পত্র ।